KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৮ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কল- ১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 9/4 10/4 11/1 11/2	Year of Publication : Oct 1986 July - Sep 87 Feb 1988 June 1988 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

বিভাব

৪০

বিশেষ সংখ্যা

বিভাব

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথঠাকুর

শাপমোচন

সম্পূর্ণ নাটক ও তার অন্তর্ভুক্ত উনত্রিশটি গানের স্বরলিপি। মূল্য ১৬·০০ টাকা

আনুষ্ঠানিক সংগীত

উৎসবে আনন্দে শোকে, পারিবারিক ও সামাজিক নানা উপলক্ষে গীত পঞ্চাশটি গানের স্বরলিপি-সংগ্রহ। প্রথম খণ্ড : ২৫টি গান। ১৫·০০।
দ্বিতীয় খণ্ড : ২৫টি গান। ১৬·০০

গীতি চর্চা

বিভিন্ন পর্যায় থেকে নির্বাচিত প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী মান থেকে আরম্ভ করে ক্রমানুযায়ী গানের তান-লয়-নির্দেশযুক্ত স্বরলিপি-গ্রন্থ। প্রতিটি খণ্ডে ত্রিশটি গান ও স্বরলিপি। মূল্য প্রথম খণ্ড ১০·০০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩·৫০, তৃতীয় খণ্ড ১০·০০ টাকা

রবীন্দ্রসংগীত
শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের গান এবং তা নিয়ে শ্রীশান্তিদেব ঘোষের আলোচনা একটি দুর্লভ সমন্বয়। তথ্যের সমাবেশে উজ্জ্বল এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রসংগীত রসপিপাসু এবং গুণীজনের কাছে গত তিন দশক ধরে যেভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে আজও তা অব্যাহত। পরিবর্ধিত সংস্করণ। ৪৫·০০ টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা-১৭
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার। ২১০ বিধান সরণী

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বর্ষা সংখ্যা ১৩৯৫

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র • কলিকাতা-৭০০ ০০৯ •

সূচি

প্রবন্ধ

কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়। রাধারমণ মিত্র ১
ভারতের প্রগতি আন্দোলনে হিউম ও
হিওম্যানের ভূমিকা। সুধী প্রধান ২৭
ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা এবং লোকসাহিত্য। পল লেভিন ৪৩
অনুবাদ : পিনাকী ভাদুড়ী
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচটি কবিতা। অভী সেনগুপ্ত ৫৭
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : ১২৫ বর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি। সুধীর চক্রবর্তী ৬৪
রবীন্দ্রসংগীত : সুরে ও বাণীর অমল-কমল মালা। আশিস বসুমল্লিক ৭৫

ক্রোড়পত্র

কাব্যরত্ন। সমরেশ বসু ৯৭
আর দেখা হবে না। বুলবুল বসু ১০৭
প্রণাম নাও, ইতি বাবুল ১১২
আমাদের তরবারি। চুনীলাল দত্ত ১১৯

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার

দেবীপ্রসাদ মজুমদার। প্রদীপ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর

6 সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলিকাতা 17

প্রচ্ছদ

শঙ্কর ঘোষ। অনুপ রায়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক 6 সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা 17 থেকে প্রকাশিত ও টেকনোপ্রিন্ট, 7 সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলিকাতা 6 থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

আকস্মিক আঘাতে যদি আমাদের কোনো প্রিয় প্রত্যঙ্গ হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয় তবে তার দিকে তাকিয়ে কোন ভাষায় শোক প্রকাশ করবো আমরা! দীর্ঘদিন যা ছিল খুব কাছের, জীবনের অমোঘ সঞ্জীবনীপ্রক্রিয়ায় ছিল যা ওতপ্রোত, যার তীব্র উপস্থিতি অনেকদিন আমাদের অন্য কারো দিকে তেমন ভাবে চোখ ফেরাতেই দেয়নি, সেই সমরেশ বসুর প্রয়াণে বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেয় প্রত্যঙ্গটি ছিন্ন হলো। অল্প শোকে কাতর, কিন্তু অধিক শোকের যে পাথর আজ আমাদের বুকের ওপর—ভাষার সাধ্য কি সেই পাথরে চিহ্ন ফোটাবার!

নিঃশ্বাসের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমরেশই যে ছিলেন সমসময়ের অবিচললেখনী লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ বা পুনর্বিচারের সময়ও নয় এখন। বেশ কিছুকাল আরো অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। এ কারণেই তাঁর স্মৃতিতে নিবেদিত এ সংখ্যার বিশেষ ক্রোড়পত্রে কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্যমূল্য নিয়ামক রচনা নেই। তার বদলে প্রয়াত লেখকের প্রিয় প্রথমা কন্যা বুলবুল বসু ও পুত্র নবকুমারের ঘনিষ্ঠ পিতৃস্মৃতিচারণে ধরা রইল নতুন এক সমরেশ। পুত্রকন্যার এই যুগল রচনায় যে বৎসল পিতা ও মানুষ সমরেশকে আমরা পাবো, অধিকাংশ পাঠকের কাছেই সেই সমরেশ নিশ্চিত তেমন পরিচিত নন। এ-ছাড়া সমরেশের অতি বাল্যের সহচর ও ক্রীড়াসঙ্গী এবং সম্ভবত এ-বঙ্গের সবচেয়ে পুরানো বন্ধু চুনীলাল বসুর অন্তরঙ্গ রচনাটিও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। ক্রোড়পত্রের সূচনায় আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া রাধারানী দেবীর যে স্নেহসিক্ত প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছে তা' অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রণিধানযোগ্য মনে হওয়ায় একমাত্র রাধারানী দেবীর প্রতিবেদনটিই আমরা ছেপেছি। সমরেশের একটি গল্পও পুনর্মুদ্রিত হ'লো। একজন কবি ও তার কবিতাকে বিষয় করে রচিত এই গল্পটি আজ থেকে সাত বছর আগে এই বিভাবেরই শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সম্ভবত এই বিষয়ের ওপর প্রয়াত লেখক আর কোনো গল্প রচনা করেননি।

এই সংখ্যায় রাজা রামমোহন রায়ের ওপর (বিভাব থেকে পুনর্মুদ্রণ) লিখেছেন রাধারমণ মিত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ওপর রচনাটি সুধীর চক্রবর্তীর।

এই সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক স্মৃতিচারণ দুটিই নানা কারণে মূল্যবান। শ্রীযুক্ত সুধী প্রধানের প্রবন্ধটির গুরুত্বও পাঠক অনুভব করবেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের অব্যবহিত পরের সময় থেকে শুরু করে যে সর্বাঙ্গীণ ক্ষোভ ও শোক মার্কিন সাহিত্য ও বুদ্ধিজীবীদের মানসে এখনো সজীব, সেই সময়কার তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা উপন্যাস ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ওপর খ্যাত আলোচক পল লেভিনের নিবন্ধটি পিনাকী ভাদুড়ী-কৃত বঙ্গানুবাদে এ-সংখ্যায় প্রকাশিত হ'লো। রবীন্দ্র-সংগীতের ওপর আলোচনাটিও বিতর্ক-সাপেক্ষ। বহুদিন পরে শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্বমহিমায় ফিরে এসেছেন এ-সংখ্যার একগুচ্ছ কবিতায়। কবিতাগুচ্ছ নিয়ে আলোচনা করেছেন অভি সেনগুপ্ত।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

[পু: এই সংখ্যা প্রকাশের ঠিক আগেই বাংলার আরেক দিকপাল লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের তিরোধান ঘটেছে। বিভাবের আগামী সংখ্যা তাঁর স্মৃতিবিজড়িত হয়ে প্রকাশিত হবে। – সম্পাদকমণ্ডলী]

কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়

শ্রীরাধারমণ মিত্র

রামমোহন রায়ের কলিকাতায় অবস্থিতি

রামমোহন দেশ হইতে আসিয়া প্রথম কলিকাতায় অবস্থান করেন ১৭৯৭ সনের আগস্ট মাস হইতে ১৭৯৯ সনের শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এইসময়ে তিনি বরাবর কলিকাতায় থাকেন নাই, মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য কলিকাতার বাহিরেও গিয়াছেন।

দ্বিতীয়বার তিনি কলিকাতায় থাকেন ১৮০০ সনের শেষ কিংবা ১৮০১ সনের প্রারম্ভ হইতে ১৮০৩ সনের মার্চ মাসের গোড়া পর্যন্ত। এই সময়ে তিনি ১৮০১ সনে সিভিলিয়ান মিঃ জন ডিগবির সহিত পরিচিত হন। এই সময়ে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান কাজী এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান ফার্সী মুন্সী ও মৌলবীগণের সহিত যথেষ্ট মেলামেশা করিতেন।

উপরোক্ত দুইবার কলিকাতায় অবস্থানকালে রামমোহন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ান কর্মচারীদিগকে টাকা কর্জ দিবার ব্যবসা করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গোলকনারায়ণ সরকার নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার কেরানী ও গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক আর এক ব্যক্তিকে তহবিলদার বা খাজাঞ্চী নিযুক্ত করেন। এই সময়ে তিনি কোম্পানীর কাগজ কেনা বেচার ব্যবসাও করিতেন। ১৭৯৭ সনে তিনি মাননীয় এণ্ড্রু র‍্যামজে নামক এক সিভিলিয়ানকে ৭৫০০৲ ও ১৮০২ সনে মিঃ টমাস উডফোর্ড নামক আর এক সিভিলিয়ানকে ৫০০০৲ কর্জ দিয়াছিলেন।

১৮০৩ সনের জুন মাসে তিনি আবার কলিকাতায় আসেন এবং এখানেই ঐ সনের মে-জুন মাসে বর্দ্ধমান শহরে লোকান্তরিত পিতা রামকান্ত রায়ের পারলৌকিক ক্রিয়া নিজ ব্যয়ে সম্পন্ন করেন। ১৮০৪ সনের প্রথম দিকে তিনি আবার কলিকাতা পরিত্যাগ করেন।

রংপুর ত্যাগ করিয়া রামমোহন কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ১৮১৪ সনের জুলাই মাসের শেষে কিংবা আগস্টের প্রথম দিকে। ১৮১৫ সনের মাঝামাঝি তাঁহাকে ভূটানে দৌত্য কার্যে যাইতে হয়। ভূটান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি

কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন ঐ সনের শেষাশেষি। কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাসকালে তিনি বেনিয়ানের ব্যবসা অবলম্বন করেন। দীর্ঘ ১৫ বৎসর কলিকাতায় বাসের পর রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন ১৯।১১।১৮৩০ তারিখে।

রামমোহনের পূর্ববর্তী কয়েকজন বিলাত যাত্রী

অনেকের ধারণা ভারতীয়দের কিংবা বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। এ ধারণা ভুল। সেখ ইহ্‌তেশাম্ উদ্দীন নামে একজন বাঙালী মুসলমান ১৭৬৫ সালে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স দেশে গমন করেন ও দেশে ফিরিয়া আসিয়া পারস্য ভাষায় তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করেন।

ইংলণ্ডে হেলিবেরি নামক স্থানে ভারতে চাকরি গ্রহণেচ্ছু সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা ইত্যাদি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজ নামে এক কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৮০৯ সনে। ঐ সনেই তিনজন ভারতীয় মুসলমান শিক্ষক হিসাবে ঐ কলেজে যোগদান করেন। তাঁহাদিগের নাম মৌলবী আব্দুল আলী, মৌলবী মির্জা খলিল ও মুন্সী গোলাম হায়দার। প্রথম দুইজন ছিলেন কলেজের প্রাচ্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও তৃতীয়জন ছিলেন আরবী ও ফার্সী লিপি শিক্ষক। এই তিনজনের ইংলণ্ডে চাকরির কাল যথাক্রমে ১৮০৯—১৮১২, ১৮০৯—১৮১৯ ও ১৮০৯—১৮২৩ খৃঃ। চতুর্থ একজন ভারতীয় মুসলমান মির্জা মহম্মদ ইব্রাহিম ঐ কলেজে ১৮২৬ হইতে ১৮৪৪ সন পর্যন্ত আরবী ও ফার্সী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন।

যদি বলা হয় রামমোহন রায় ভারতীয় বা বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে প্রথম বিলাত যাত্রী, সে কথাও ঠিক নয়। রামমোহনের প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে বোম্বাইয়ের দুইজন ব্রাহ্মণ বিলাত গিয়াছিলেন। গণেশ দাস নামক একজন বাঙালী হিন্দু ১৭৬৫ সনে কিংবা তাহার কিছু পরে ইউরোপ গমন করেন। ১৭৭৪ সনে কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইলে গণেশ দাস ঐ কোর্টের ফার্সী অনুবাদক নিযুক্ত হন। ১৭৭৫ সনের জুন মাসে তিনি রেভারেণ্ড কিয়ারন্যাণ্ডারের নিকট খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা

(১) রামমোহন রায়ের দাদা ৺জগমোহন রায়ের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়, ২৩।৬।১৮১৭ তারিখে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্টের একুইটি বিভাগে

রামমোহনের বিরুদ্ধে এক মোকর্দ্দমা রুজু করেন। তাহাতে তিনি রামমোহন রায়ের সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দাবী করেন এই বলিয়া যে রামমোহনের ও তাঁহার পিতার সম্পত্তি যৌথ সম্পত্তি ছিল। বিচারের শেষ দিনে বাদী ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতে উপস্থিত না থাকায় প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট ১০।১২।১৮১৯ তারিখে মায় খরচ-খরচা মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দেন।

(২) ঐ জগমোহন রায়ের বিধবা পত্নী ও গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মাতা দুর্গাদেবী ১৩।৪।১৮২১ তারিখে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের একুইটি বিভাগে এক মোকর্দ্দমা দায়ের করেন। তাহাতে তিনি রামমোহনের রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুর নামে দুই তালুক নিজের সম্পত্তি বলিয়া দাবী করেন এই অজুহাতে যে এই দুই সম্পত্তি রামমোহন বাদীর নিকট হইতে ৪৫০০৲ কর্জ করিয়া খরিদ করেন। ৩০।১১।১৮২১ তারিখে খরচ-খরচা সমেত মোকর্দ্দমা খারিজ হইয়া যায়।

(৩) ১৬।৬।১৮২৩ তারিখে বর্দ্ধমানাধীশ মহারাজা তেজচন্দ্র রামমোহন ও গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের বিরুদ্ধে কলিকাতার প্রভিন্সিয়াল কোর্টে ১২,৬০৪৲, ৫৬,৮০৭৲ ও ১৫,২০০৲ দাবী করিয়া তিনটি মামলা রুজু করেন, রামমোহনের স্বর্গীয় পিতার স্বাক্ষরিত তিনটি কিস্তিবন্দী খতের বলে। খরচ-খরচা সমেত মামলা তিনটি খারিজ হইয়া যায়। মহারাজা তেজচন্দ্র সদর দেওয়ানি আদালতে আপিল করেন। সে আপিলও খরচা সমেত খারিজ হইয়া যায়। প্রথম মোকর্দ্দমাটি খারিজ হয় ১০।১১।১৮৩০ তারিখে ও শেষ দুটি ১০।১১।১৮৩১ তারিখে।

(৪) শেষ মোকর্দ্দমা হয় রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের বিরুদ্ধে। বর্দ্ধমান কালেকটারীতে নায়েব সেরেস্তাদারের পদে অস্থায়ীরূপে কার্য করিবার সময় রাধাপ্রসাদ সরকারী তহবিল তছরুপ করিয়াছিলেন এই অভিযোগে তাঁহাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হয়। মোকর্দ্দমা ১৮২৫ ও ১৮২৬ এই দুই বৎসর চলে। শেষে রাধাপ্রসাদ নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ যে যন্ত্রণা ও নির্যাতন পুত্রকে ভোগ করিতে হয় তাহার ফলে পিতা রামমোহনের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ হয়।

কলিকাতায় রামমোহনের বাটী

বিভিন্ন সময়ে কলিকাতায় রামমোহনের নাকি চারিখানি বাড়ী ছিল, যথা—(১) সম্পত্তি বিভাগের সময় তিনি পিতার নিকট হইতে জোড়াসাঁকোয় একখানি বাড়ী পাইয়াছিলেন; (২) ও (৩) ১৮১৪ সনে রংপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন দুইখানি বাড়ী খরিদ করেন। প্রথমটি চৌরঙ্গীতে হাতাসুদ্ধ একটি দ্বিতল বাটী। এটি শ্রীমতী এলিজাবেথ ফেনউইক নাম্নী এক মহিলার নিকট হইতে তিনি ২০,৩১৭ টাকায় ক্রয় করেন। দ্বিতীয় বাড়ীটি ক্রয় করেন সিমলায় ফ্রান্সিস মেণ্ডিস নামে এক সাহেবের নিকট হইতে ১৩,০০০ টাকায়। (৪) চতুর্থ বাড়ীটি ছিল তাঁহার বিখ্যাত মাণিকতলার উদ্যানবাটী, যেটি তিনি নাকি তাঁহার জ্ঞাতি ভাই রামতনু রায়ের দ্বারা সাহেবী ধরনে তৈয়ারি ও সজ্জিত করাইয়া ছিলেন।

এই শেষোক্ত বাড়ীটির উপরতলায় ছিল তিনটি বড় হল, ছয়টি কামরা, দুইটি বারান্দা ও নীচের তলায় অনেকগুলি কুঠরী ছিল। আর ছিল গুদাম, বাবুর্চি-খানা, আস্তাবল প্রভৃতি। আরো ছিল নানাপ্রকার ফলের গাছ ও তিনটি বড় পুষ্করিণী সমেত ১৫ বিঘা জমির একটি বাগান। এই বাগানবাড়ীতে রামমোহন সাড়ম্বরে বাস করিতেন এবং তাঁহার দেশী ও বিদেশী বন্ধুগণকে খানাপিনায় ও নাচ গানে আপ্যায়িত করিতেন। বিদেশী পরিব্রাজকগণের মধ্যে ফিট্‌স ক্লারেন্স (আর্ল অব মান্‌ষ্টার), ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভিক্তর জাকমঁ ও ইংরাজ মহিলা ফ্যানী পার্কস এই বাড়ীতে রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শেষোক্ত ইংরাজ মহিলা তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ১৮২৩ সনের মে মাসে রামমোহনের এই বাগান-বাড়ীতে একটি উৎসবের বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বাড়ীর বড় হাতার মধ্যে খাসা রোশনাই ও দিব্য আতসবাজী পোড়ান হইয়াছিল। বাড়ীর প্রতিটি ঘরে নাচওয়ালীরা নাচগান করিতেছিল। এই নাচওয়ালীদের মধ্যে নিকীও ছিল—তাহাকে প্রাচ্য জগতের 'কাটালানী' বলা হইত।" এই বাড়ীটি বর্তমানে ১১৩নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়ী। কলিকাতা পুলিশের উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের আপিস এই বাড়ীতে।

(১) ও (২) নং বাড়ী অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়ী ও চৌরঙ্গীর খরিদা বাড়ী আজ পর্যন্ত সনাক্ত করিতে পারা যায় নাই।

বাকি রহিল সিমলার বাড়ী। বলা হয় এটি রামমোহনের ৮৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাসগৃহ। এই বাটীর গাত্রে একটি মর্ম্মর ফলকে ইংরেজিতে লিখিত আছে—"এই বাড়ীতে রাজা রামমোহন রায় ১৮১৪ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

বাস করিয়াছিলেন।" পাথরের উপর লিখিত হইলেও এই লেখাটি এই ব্যাপারে 'পাথুরে প্রমাণ' নয় যে রামমোহন এই বাড়ীতে বাস করিতেন অথবা এই বাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, রামমোহন এই বাড়ীতে একদিনও যে বাস করিয়াছিলেন তাহার আদৌ কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার জীবনের কোন ঘটনাই এই বাড়ীতে ঘটে নাই। তাঁহার সম্বন্ধে যাঁহারাই কিছু লিখিয়াছেন তাঁহারাই মাণিকতলার বাগান বাড়ীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, মেণ্ডিস সাহেবের নিকট হইতে খরিদ করিয়া থাকিলে এই বাড়ীও সাহেবী ধরনের বাড়ী হইত। কিন্তু এই বাড়ী আদৌ সাহেবী ধরনের নয়, সম্পূর্ণ বাঙালী ধরনের বাড়ী। তৃতীয়তঃ, ঐ বিশাল অট্টালিকা ও সংলগ্ন বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সেই যুগেও মাত্র ১৩,০০০ টাকায় পাওয়া সম্ভব ছিল না। চতুর্থতঃ, ১৮১৪-১৮১৫ সনে আমহার্ষ্ট স্ট্রীট নামক রাস্তাই হয় নাই। হইয়াছে ১৮২৩-১৮২৪ সনে। সুতরাং যখন রাস্তাই ছিল না তখন রাস্তার ধারে দুইটি প্রধান ফটক নির্মাণ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা বোধগম্য নয়।

সেইজন্য ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন মাণিকতলার বাগান বাড়ীই সিমলার বাড়ী, ফ্রান্সিস মেণ্ডিস সাহেবের নিকট হইতে ক্রয় করা (সেইজন্য সাহেবী ধরনে নির্মিত ও সজ্জিত—রা মি)। ঐ বাড়ীকে যেরূপ মাণিকতলার বাড়ী বলা হয় সেইরূপ সিমলার বাড়ীও বলা যাইতে পারে। কারণ ঐ বাড়ী প্রায় সুকিয়া স্ট্রীটের সংলগ্ন এবং সুকিয়া স্ট্রীটের সেকালে নাম ছিল 'বাহির সিমলা'। এই বাড়ী বিক্রয়ের যে বিজ্ঞাপন ৯।১।১৮৩০ তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতেও বলা হইয়াছিল, "অপার সার্কুলার রোড সিমলার মাণিকতলাস্থিত বাটী ও বাগান।"

তৎসত্ত্বেও যদি মাণিকতলার বাড়ীকে সিমলার বাড়ী বলিয়া স্বীকার করিতে একান্তই আপত্তি হয়, তাহা হইলে ৮৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাড়ীর বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্বদিকে রামমোহন এক বাড়ি খরিদ করিয়া থাকিতে পারেন। সেইটিকে হয়ত রামমোহনের সিমলার বাড়ি বলা হইত। ১৮৫৭ সনের কলিকাতার ডিরেক্টারীতে আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের পূর্বদিকে তখনকার ৪৮ নং বাড়ীটি, সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল মিঃ রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়ী বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ঐ বাড়ী কে করিয়াছিলেন—রামমোহন রায় না রমাপ্রসাদ রায় তাহা জানিবার উপায় নাই। ঐ ডিরেক্টারী অনুসারে ৮৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের জমির উপর

কাহারও বাড়ি ছিল না, রামমোহনের তো নয়ই। তখন ঐ জায়গাটার নম্বর ছিল ৬০ আর সেখানে একটি লবণের চৌকি ছিল।

রাজা রামমোহন রায়ের আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাড়ী সম্বন্ধে ৺তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (যিনি নিজে রামমোহন রায়ের পৌত্রীর প্রপৌত্র সুতরাং ঐ বংশেরই সন্তান) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন "সত্যই কি ঐ বাড়ী রামমোহনের বাড়ি?" এবং মন্তব্য করিয়াছিলেন যে "রামমোহনের আত্মীয় স্বজন ও বংশধরদের মধ্যে এই কথাই প্রচলিত আছে যে বাড়িটি প্রকৃত প্রস্তাবে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের, রামমোহনের মৃত্যুর অনেক পরে তিনি ঐ বাড়ি তৈয়ারি করেন।" তিনি আরও লিখিয়াছিলেন, "একথার একটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় ১৮৫২ সনে মারা যাইবার পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় রাধাপ্রসাদের ওয়ারিশানদিগের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে পৈতৃক যৌথ বিষয় সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারার এক মামলা দায়ের করেন। ঐ মামলায় যৌথ সম্পত্তির যে ফর্দ দাখিল করা হইয়াছিল তাহাতে ঐ বাড়ির কোন উল্লেখ ছিল না।" তপনমোহনের জীবদ্দশায় তাঁহার কথার খণ্ডন বা প্রতিবাদ কেহই লিখিতভাবে করেন নাই। তপনমোহন পরোক্ষ প্রমাণের কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা জানিতেন না। তাঁহার কথা শুনিয়াই আমার এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের স্পৃহা জাগে। ফলে আমি ১৮৫৭ সনের ডিরেক্টারীতে তপনমোহনের উক্তি যে যথার্থ তাহার প্রমাণ পাই। শুধু ১৮৫৭ সনে ডিরেক্টারীই নয়, প্রায় সমসাময়িক একটি কলিকাতার মানচিত্র হইতেও ঐ একই কথা প্রমাণিত হয়। ১৮৪৭-৪৯ সনে এফ. ডবলিউ সিমসের মানচিত্রে ৮৫নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের স্থলে কতকগুলি একতলা কাঁচা বাড়ি দেখানো আছে। একটিও পাকা দোতলা তিনতলা বাড়ির চিহ্ন মাত্র নাই। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে ১৮৫৭ হইতে ১৮৬২ সনের মধ্যে কোনও একসময়ে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান সরকারী উকিল প্রভূত বিত্তশালী রমাপ্রসাদ রায় বর্তমান ৮৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তৎপূর্বে তিনি পূর্বদিকের সামান্য একটি বাড়িতে বাস করিতেন। ঐ বাড়িটি দীর্ঘকাল যাবৎ রায় বাবুদের কাছারি বাড়ি বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

পরিশেষে বক্তব্য হেঁদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণে যে বাড়িতে রামমোহনের এ্যাংলো হিন্দু স্কুল বসিত সেই বাড়িটি কলিকাতায় রামমোহনের চারিটি বাড়ির মধ্যে কেহ গণ্য করেন নাই। অথচ ৬।১০।১৮৩৯ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

তত্ত্ববোধিনী সভার বিবরণে পাইতেছি যে, "এই সভার অধিবেশন হইত প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, তাহার পর সিমুলিয়াস্থ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের, তাহার পর হেঁদুয়ার দক্ষিণস্থ রমাপ্রসাদ রায়ের বাটীতে এবং সর্বশেষে সমাজ গৃহে স্থানান্তরিত হইবার পূর্বে রমানাথ ঠাকুরের ভবনে।" ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে এই বাড়িটি রামমোহনেরই ছিল। অতএব—এই বাড়িও তাঁহার সিমলার বাড়ি হইতে পারে।

রামমোহন কলিকাতা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন :

(১) The Brahmunical Magazine or the Missionary and the Brahmun, Nos. I. II. and III—ব্রাহ্মণ সেবধি : ব্রাহ্মণ ও মিশনারি সংবাদ (সংখ্যা ১.২.৩)—১৮২১।
প্রথম তিন সংখ্যা বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই ১৮২১ সনে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ সংখ্যা শুধু ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়—১৫।১১।১৮২৩ তারিখে।

(২) সম্বাদ কৌমুদী (সাপ্তাহিক)—৪।১২।১৮২১

(৩) মীরাৎ-উল-আখবার (বাংলাদেশে পারস্য ভাষায় প্রথম সাপ্তাহিক)—১২।৪।১৮২২
শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৪।৪।১৮২৩ তারিখে। ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হইত।

(৪) ৯।৫।১৮২৯ হইতে ৩০।৭।১৮২৯ তারিখ পর্যন্ত রামমোহন রায় Bengal Herald-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

রামমোহন কলিকাতায় নিম্নলিখিত সভাগুলি প্রতিষ্ঠা করেন :

(১) আত্মীয় সভা—মার্চ, ১৮১৫

(২) ইউনিটেরিয়ান কমিটি—সেপ্টেম্বর, ১৮২১

(৩) ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজ—২০।৮।১৮২৮ তারিখে (বাংলা ৬ই ভাদ্র) জোড়াসাঁকোর ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়ীর ভাড়া করা দুইখানি বাহিরের ঘরে। ঐ বাড়ীর বর্তমান নম্বর ২২৮ আপার চীৎপুর রোড।

(৪) জোড়াসাঁকোর নিজস্ব গৃহে (৫৫।১ নং আপার চীৎপুর রোড) ব্রাহ্মসমাজ স্থানান্তরিত হয়—২৩।১।১৮৩০ তারিখে। (বাংলা ১১ই মাঘ)

রামমোহন কলিকাতায় নিম্নলিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত করেন :

(১) হেঁদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮২২ সনে।

মিঃ উইলিয়াম এ্যাডাম এই স্কুলের দুইজন পরিদর্শকের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। 'ক্যালকাটা জার্নালে'র সহকারী সম্পাদক এবং বিলাতে রামমোহন রায়ের সেক্রেটারী মিঃ স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এই স্কুলে চারিটি শ্রেণী ছিল। ১৮২৭ সনে এই স্কুলে মাত্র দুইজন শিক্ষক ছিলেন। একজনের বেতন ছিল মাসিক ১৫০৲ এবং দ্বিতীয় জনের ৭০৲। ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬০ হইতে ৮০। ১৮২৮ সনে রামমোহনের সহিত মতভেদ হওয়ায় মিঃ এ্যাডাম এই স্কুলের পরিদর্শকের পদ ত্যাগ করেন। ১৮২৮ ও ১৮২৯ সনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৮৩০ সনে বিলাত যাত্রাকালে রামমোহন প্রধান শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র মিত্রের উপর এই স্কুল পরিচালনার ভার দিয়া যান। পূর্ণচন্দ্র মিত্র এই স্কুলের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইণ্ডিয়ান একাডেমি রাখেন। নবীনমাধব দে বা দেব প্রথমে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরে শিক্ষক হন। প্রধান শিক্ষকের সহিত তাহার বিবাদ হওয়ায় তিনি এই স্কুলের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজে একটি স্বতন্ত্র স্কুল স্থাপন করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৩৭ সনে পূর্ণচন্দ্র মিত্রের ইণ্ডিয়ান একাডেমিতে এক বৎসর ও ১৮৩৮ সনে নবীনমাধব দের স্কুলে প্রায় এক বৎসর পাঠ করেন।

(২) সংস্কৃত কিংবা বাঙলা ভাষায় বেদান্ত তত্ব শিক্ষা দিবার জন্য রামমোহন ১৮২৬ সনের জুন বা জুলাই মাসে বেদান্ত কলেজ স্থাপিত করেন।

জেনারেল এ্যাসেমব্লি ইনষ্টিটিউশন স্থাপনে রামমোহনের সাহায্য

পাদরি আলেকজাণ্ডার ডাফ ২৭।৫।১৮৩০ তারিখে কলিকাতায় আসিয়া একটি ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে দেশী পাড়ায় একটি বাড়ীর সন্ধান করিতেছিলেন কিন্তু পাইতেছিলেন না। রামমোহনকে ধরিলে রামমোহন তাঁহাকে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ীর বাহিরের দুইখানি খালি ঘর—যেখানে পূর্বে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ ভাড়া ছিল—ডাফ সাহেবকে পূর্বাপেক্ষা কম ভাড়ায় সংগ্রহ করিয়া দেন। নিজের বন্ধুদিগকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহাদের পুত্রগণকে ডাফের স্কুলের প্রথম

ছাত্ররূপে সংগ্রহ করিয়া দেন। প্রথমে মাত্র পাঁচজন ছাত্র পাওয়া গিয়াছিল। ডাফ সাহেব এই পাঁচটি ছাত্র লইয়া ঐ দুইখানি ভাড়া ঘরে ১৩।৭।১৮৩০ তারিখে তাঁহার স্কুল জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা দিবসে রামমোহন প্রথম হইতেই উপস্থিত ছিলেন। ডাফ সাহেব বাইবেল হইতে 'প্রভুর প্রার্থনা' আবৃত্তি করিলেন। তাহাতে কাহারো আপত্তি হইল না। কিন্তু তাহার পর যখন তিনি ছাত্রগণের হস্তে বাইবেল দিয়া তাহাদের পড়িতে বলিলেন তখন তাহাদের মধ্য হইতে আপত্তিসূচক মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল। রামমোহন তখন ছাত্রদিগকে বলিলেন, "ডাক্তার হোরেস হেম্যান উইলসনের মত খ্রীষ্টান সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন কিন্তু তাই বলিয়া তিনি হিন্দু হন নাই। আমি নিজে সমগ্র কোরাণ বারম্বার পাঠ করিয়াছি তাহার ফলে আমি কি মুসলমান হইয়া গিয়াছি? আমি সমগ্র বাইবেল আগাগোড়া পাঠ করিয়াছি কিন্তু তোমরা জান আমি খ্রীষ্টান হইয়া যাই নাই। তাহা হইলে তোমরা বাইবেল পড়িতে ভয় পাইতেছ কেন? উহা পাঠ কর ও নিজেরাই বিচার করিয়া দেখ।"

এই কথা শুনিয়া আপত্তিকারীরা নীরব হইল। ইহার পর রামমোহন পরবর্তী পুরা দেড় মাস কাল প্রতিদিন সকাল দশটায়—যখন বাইবেল শিক্ষা দেওয়া হইত—ডাফের স্কুলে উপস্থিত থাকিয়াছেন। পরেও মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতেন।

এই সূত্রে উল্লেখ্য যে চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের প্রথম মিশনারিরূপে ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডাফকে কলিকাতায় আনাইবার ব্যাপারে রামমোহনেরও কিছু হাত ছিল। রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন বলিয়া চার্চ অব ইংল্যাণ্ড ও ব্যাপটিস্ট্ চার্চের সহিত তাঁহার বনিবনা হইত না। কারণ এই দুটি চার্চ ত্রীশ্বরবাদী। কিন্তু চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড বা প্রেসবিটিরিয়ান চার্চ ত্রীশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন এই চার্চের পক্ষপাতী ছিলেন। এমনকি কলিকাতায় সেণ্ট এণ্ড্রুজ চার্চের তিনি মণ্ডলীভুক্ত ছিলেন। এই গীর্জায় যাইয়া উপাসনা করিতেন। এই গীর্জার পাদরী ডক্টর ব্রাইস ১৮২৪ সনে স্কটল্যাণ্ডে জেনারেল এ্যাসেমব্লির নিকট ব্রিটিশ ভারতে একজন মিশনারি পাঠাইবার জন্য আবেদন পাঠান। তৎপূর্বে ৮।১২।১৮২৩ তারিখে রামমোহন ডক্টর ব্রাইসের ঐ আবেদন লিখিতভাবে সমর্থন করেন।

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের বাংলা রচনাবলী :

১) বেদান্তগ্রন্থ — ১৮১৫

২) বেদান্ত সার — ১৮১৫

৩) তলবকারোপনিষদ্ (কেনোপনিষৎ) —জুন, ১৮১৬
৪) ঈশোপনিষদ্ —জুলাই, ১৮১৬
৫) ভট্টাচার্যের সহিত বিচার —মে, ১৮১৭
৬) কঠোপনিষদ —আগস্ট, ১৮১৭
৭) মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ —অক্টোবর, ১৮১৭
৮) গোস্বামীর সহিত বিচার —জুন, ১৮১৮
৯) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ —নভেম্বর, ১৮১৮
১০) গায়ত্রীর অর্থ —১৮১৮
১১) মুণ্ডকোপনিষদ্ —মার্চ, ১৮১৯
১২) শঙ্করাচার্যের 'আত্মানাত্ম বিবেক'এর বাংলা অনুবাদ —১৮১৯ (?)
১৩) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ —নভেম্বর, ১৮১৯
১৪) কবিতাকারের সহিত বিচার —১৮২০
১৫) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার —১৮২০
১৬) চারি প্রশ্নের উত্তর —মে, ১৮২২
১৭) প্রার্থনাপত্র —মার্চ, ১৮২৩
১৮) পাদরি ও শিষ্য সংবাদ —১৮২৩ (?)
১৯) গুরু পাদুকা —১৮২৩ (অপ্রাপ্য)
২০) পথ্য প্রদান —ডিসেম্বর, ১৮২৩
২১) ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ —১৮২৬
২২) কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার —১৮২৬
২৩) বজ্রসূচী (১ম নির্ণয়) —১৮২৭
বৌদ্ধ বজ্রসূচী উপনিষদের বঙ্গানুবাদ
২৪) ব্রহ্মোপাসনা —১৮২৮
২৫) ব্রহ্মসঙ্গীত —১৮২৮
২৬) অনুষ্ঠান —১৮২৯
২৭) সহমরণ বিষয়ে —১৮২৯
২৮) গৌড়ীয় ব্যাকরণ —১৮৩৩
২৯) ভগবদ্গীতার পদ্যে অনুবাদ (অপ্রাপ্য)

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের সংস্কৃত গ্রন্থাবলী :

১) উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার — ১৮১৬-১৭
(তিনখানি পুস্তিকা)
২) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার — ১৮২০
৩) গায়ত্র্যা পরমোপাসনা বিধানং — ১৮২৭
) ক্ষুদ্রপত্রী
(উপনিষদের দুইটি শ্লোক ও রামমোহন বিরচিত দুইটি শ্লোক)
প্রকাশকাল অজ্ঞাত।

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের হিন্দি গ্রন্থাবলী :

১) বেদান্ত গ্রন্থ — ১৮১৫ (?) (অপ্রাপ্য)
(বাংলা বেদান্ত গ্রন্থের হিন্দি অনুবাদ)
২) বেদান্তসার — ১৮১৫ (?) (অপ্রাপ্য)
(বাংলা বেদান্ত সারের হিন্দি অনুবাদ)
৩) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার — ১৮২০
(সংস্কৃত পুস্তিকার হিন্দি অনুবাদ)

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের ইংরাজী গ্রন্থাবলী :

১) Translation of an Abridgement of the Vedant or Resolution of all the Veds—1816.
২) Translation of the Cena Upanishad—1816.
৩) Translation of the Ishopanishad—1816.
৪) A Defence of Hindoo Theism—1817.
৫) A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas —1817.
৬) Counter-petition of the Hindu Inhabitants of Calcutta against Suttee—1818.
(রামমোহনের রচনা বলিয়া প্রচলিত)
৭) Translation of a Conference between an Advocate for,

and an Opponent of, the Practice of Burning Widows Alive, from the original Bungla—1818.

৮) Translation of the Moonduk Opunishud—1819.

৯) Translation of the Kut'h-Opunishud—1819.

১০) An Apology for the pursuit of Final Beatitude, independentedly of Brahmunical Observances—1820.

(সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচারের অনুবাদ)

১১) A Second Conference between an Advocate for, and an Opponent of, the Practice of Burning Widows Alive—1820 (Translated from the original Bengalee).

১২) The precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness, with translations into Sungscrit and Bengali—1820.
(But these translations were never published by Rammohan)

১৩) An Appeal to the Christian Public in Defence of precepts of Jesus—1820.

১৪) Second Appeal to the Christian Public in Defence of Precept of Jesus—1821.

১৫) Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindoo Law of Inheritance—1822.

১৬) Final Appeal to the Christian Public in Defence of Precepts of Jesus—1823.

১৭) Humble Suggestions to his Countrymen who believe in one True God—1823.

১৮) Petitions against the Press Regulations
(a) Memorial to the Supreme Court—1823.
(b) Appeal to the King in Council—1823 (? 1825)

১৯) A few Queries for the Serious Consideration of Trinitarians Part I and II—1823.

২০) A Dialogue between a Missionary and three Chinese Converts—1823.

(পাদরি ও শিষ্য সংবাদের ইংরাজী অনুবাদ)

২১) A Vindication of the Incarnation of the Deity as a common basis of Hinduism and Christianity against the Schismatic attacks of R. Tytler, Esqur. M. D.—1823.

২২) A Letter to Lord Amherst on Western Education dated 11. 12. 1823.

২৩) A Letter to the Revd. Henry Ware on the prospects of Christinity in India—1824.

২৪) Translation of a Sanskrit Tract on Different Modes of Worship—1825.

২৫) Bengalee Grammer in English Language—1826.

২৬) A Translation into English of Sanskrit Tract, including the Divine Worship—1827.

২৭) Translation into English of Sanskrit Tract গায়ত্র্যা পরমোপাসনা বিধানম্—1827.

২৮) Answer of a Hindoo to the question "Why do you frequent Unitarian Places of Worship instead of the numerously attended Established Churches ?"—1827.

২৯) Symbol of the Trinity—1828 (?)

৩০) The Universal Religion—1829.

৩১) Petition to the Government against Regulation III of 1828 for the resumption of Lakheraj Lands—1829.

৩২) Petition of the Padishah (Akbar II) of Delhi to King George IV of England—1829.

৩৩) Address to Lord William Bentinck, Governor General of India, upon the passing of the Act for the abolition of Suttee—1830.

৩৪) Essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property according to the Law of Bengal—1830.

৩৫) Letters on Hindu Law of Inheritance—1830.

৩৬) Abstract of Arguments regarding the burning of widows considered as a religious rite—1830.

৩৭) Counter-petition to the House of Commons to the Memorial of the Advocates of the Suttee—1830.

৩৮) On the Possibility, Practicability and Expediency of Substituting the Bengali Language for the English.

রনচাকাল অজ্ঞাত। রামমোহনের জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত।

৩৯) Hindu Authorities in favour of slaying the Cow and eating its flesh.

রচনাকাল অজ্ঞাত, অপ্রকাশিত।

[৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়' ও কুমারী সোফিয়া ডবসন কোলেটের "দি লাইফ এণ্ড লেটারস অব রাজা রামমোহন রায়"-এর সাহায্যে এই গ্রন্থপঞ্জী সংকলিত।]

রাজা রামমোহন রায়ের বংশলতা

২৩ শ্রীবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পৌরোহিত্য আদি কুল ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া নবাব সরকারের উচ্চপদে কর্ম করিতেন)

২৪ কৃষ্ণচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) রায়

(নবাব সরকার হইতে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। আদি নিবাস মুর্শিদাবাদ জিলার শাকা গ্রামে। বিষয়কর্ম উপলক্ষে হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া স্থানটি খুব পছন্দ হওয়ায় মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া রাধানগরে নবাব সরকারের খাস জমিতে গৃহ নির্মাণ করিয়া বসবাস করেন। নবাব কর্তৃক বর্দ্ধমানরাজ জগৎরাম রায়ের একজন প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন।)

২৫ অমরচন্দ্র রায় | হরিপ্রসাদ রায় | ব্রজবিনোদ রায়

ব্রজবিনোদ রায়: মৃত্যু ১৭৬৮ সনে

(আলীবর্দী খাঁর শাসনকালে তাঁহার বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম যখন পূর্বদেশে ছিলেন, তখন ব্রজবিনোদ তাঁহার অধীনে কর্ম করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন।)

ব্রজবিনোদ রায়

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

২৬ নিমানন্দ রায় | রামকিশোর রায় | রাধামোহন রায় | গোপীমোহন রায় | রামকান্ত রায় | রামরাম রায় | বিষ্ণুরাম রায়

(ইহারা সকলে রাধানগরের পৈতৃক ভদ্রাসনে বাস করিলেও পৃথগন্ন ছিলেন। প্রত্যেকের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিও স্বতন্ত্র ছিল।)

২৭ নবকিশোর রায়

২৮ শ্রীনাথ রায়

২৯ গোপীনাথ রায়

৩০ পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি

(সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও হ্যানিম্যানের জীবনীকার, শেষ জীবনে হাওড়া-ব্যাটরা স্কুলের শিক্ষক। 'পুরোহিত' ও 'অনুশীলন ও পরহিত' মাসিক পত্রের সম্পাদক। জন্ম—২৭।৩।১৮৫৪ ; মৃত্যু—১৮।১১।১৯১২)

২৬ রামকান্ত রায়

মৃত্যু—মে-জুন ১৮০৩

রাধানগরের পৈতৃক ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে বাটী নির্মাণ করিয়া বাস করেন। ইহার তিন বিবাহ। প্রথমা পত্নী সুভদ্রাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন। দ্বিতীয়া পত্নী তারিণীদেবী (ফুল ঠাকুরাণী) চাতরার শ্যাম ভট্টাচার্য ওরফে দেবগুরু ভট্টাচার্যের

কন্যা। ইনি ১৮২০ সনে শ্রীক্ষেত্রে একাকী যাত্রা করেন ও ২১।৪।১৮২২ তারিখে শ্রীক্ষেত্রেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তৃতীয়া পত্নী রামমণি দেবী রামশঙ্কর রায়ের কন্যা।

২য়া পত্নী তারিণীদেবীর গর্ভে

২৭ কন্যা =শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

২৮ গুরুদাস মুখোপাধ্যায়

জগমোহন রায়
মৃত্যু—মার্চ-এপ্রিল ১৮১২।
ইহারও তিন বিবাহ। এক পত্নীর নাম দুর্গাদেবী।
ইহার গর্ভে

২৮ গোবিন্দপ্রসাদ রায়
জন্ম—১৭৯৭ সন

(রাজা) রামমোহন রায় জন্ম—১৬।৫।১৭৭৪। ইহার জন্মের বিভিন্ন বৎসরের উল্লেখ পাওয়া যায়। অধিকাংশের মতে ১৭৭৪ সাল। মৃত্যু—২৭।৯।১৮৩৩ ইংল্যাণ্ডের ব্রুস্টল নগরে। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ইহারও তিন বিবাহ। ইহার যখন মাত্র ৮ বৎসর বয়স তখন ইহার প্রথমা স্ত্রীর (নাম অজ্ঞাত) মৃত্যু হয়। পরবৎসর বর্দ্ধমান জেলার কুড়মন পলাশী গ্রামের শ্রীমতী দেবীর সঙ্গে পিতা ইহার বিবাহ দেন। অল্পদিন পরে দ্বিতীয়া পত্নী বর্তমান থাকিতেই কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী উমাদেবীর সহিত পিতা

৩য়া পত্নী রামমণি দেবীর গর্ভে

২৭ রামলোচন রায়
১৮১৩ সনের পূর্বে মৃত্যু।
অপুত্রক।

২৯ শ্রীপতি ভূপতি

|

৩০ ক্ষিতিপতি

|

৩১ শচীপতি

ইহার বিবাহ দেন। উমাদেবীর সন্তানাদি হয় নাই। রামমোহন লাঙ্গুলপাড়ার পৈতৃক বাটী ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী রঘুনাথপুর গ্রামে নিজস্ব বাটী নির্মাণ করেন।

২৭ রামমোহন রায়
=শ্রীমতী দেবী

২৮ রাধাপ্রসাদ রায়
জন্ম—১৮০০ সনের শেষে কিংবা ১৮০১ সনের প্রথমে।
মৃত্যু—কলিকাতায় ৯।৩।১৮৫২ তারিখে।
কলিকাতায় ও কৃষ্ণনগরে কর্ম করিতেন।
=হুগলী জেলার ইড় পাড়া গ্রামের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা

|

কন্যা

২৯ চন্দ্রজ্যোতি
=শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়

রায় বাহাদুর
রমাপ্রসাদ রায়
জন্ম—রঘুনাথপুরে ২৮।৭।১৮১৭
মৃত্যু—কলিকাতায় ১।৮।১৮৬২

পিতার এ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে, পেরেণ্ট্যাল একাডেমিক ইনষ্টিটিউশনে এবং হিন্দু কলেজে শিক্ষা। ১৮৩৮ সনে ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত। ১৮৪৫ সনে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী আরম্ভ। ১৮৫০ সনের আগষ্ট মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুর অবসর গ্রহণ করিলে রমাপ্রসাদ তাঁহার শূন্যস্থলে সদর দেওয়ানী আদালতের সরকারী উকিল নিযুক্ত। ১৮৬১ সনের মধ্যভাগে মিঃ বোফোর্টের স্থানে লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার নিযুক্ত। ১৮৬২ সনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত। ইহার প্রথমা স্ত্রী অতি অল্প বয়সেই মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পরে ৺মৃত্যুঞ্জয় আগমবাগীশের কন্যা দ্রবময়ীকে বিবাহ করেন। নব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিচারাসনে বসিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে স্বোপার্জিত ২২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ করেন হিন্দুমতে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে মৌখিক সমর্থন জানাইয়াও প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করিতে অস্বীকার করেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় রমাপ্রসাদের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো রামমোহন রায়ের ছবিটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন "ওটা নামিয়ে ফেল"। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

২৮ রমাপ্রসাদ রায়
=দ্রবময়ী দেবী

হরিমোহন রায়
জন্ম—মে-জুন, ১৮৪৮
মৃত্যু—২২।৩।১৮৯৭

প্যারীমোহন রায়
জন্ম—অক্টোবর-নভেম্বর, ১৮৫০
মৃত্যু—১২।৬।১৯৪৮

অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। শখের যাত্রার দল ও সুন্দর পশুশালা করেন। বিলাসিতার জন্য বিষয় সম্পত্তি অনেক নষ্ট করেন।

=গোলাপসুন্দরী

|

৩০ কন্যা

হরিমোহন অপুত্রক হওয়ায় তাঁহার কন্যার বংশধরগণ মাতামহের অবশিষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'ন।

খুব বলবান, সংগীতের অনুরাগী ও উৎকৃষ্ট বাদক ছিলেন। অপুত্রক।

|

৩০ ধরণীমোহন রায়
(পোষ্যপুত্র)
মৃত্যু—২৫।৭।১৯৭০, ৮৩ বৎসর বয়সে।
=হেতমপুরের মহারাজ কুমার নিরঞ্জন চক্রবর্তীর কন্যা প্রমোদবালা দেবী, এখনো জীবিতা, বর্তমান বয়স ৭৩ বৎসর।

|

৩১ ৺সবিতামোহন রায়
১৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু।

শচীন্দ্রমোহন রায়
মৃত্যু—১২।১২।১৯৭০
৪৯ বৎসর বয়সে।
=আরতিরাণী দেবী জীবিতা, বর্তমান বয়স ৪০ বৎসর।

|

৩২ কন্যা — বিবাহিতা — বয়স ২৮ বৎসর | পুত্র — অবিবাহিত | কন্যা — বিবাহিতা | পুত্র — অবিবাহিত — বয়স ২০ বৎসর

৮৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রিটের বাড়ি বিক্রি হইয়া গিয়াছে।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের শাখা

রাধাপ্রসাদ রায়

|

কন্যা

২৯ চন্দ্রজ্যোতি

=শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়

|

৩০ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় | কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় | কন্যা | কন্যা | নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়

কন্যা
=নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়
কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান।

|

দেবীবর মুখোপাধ্যায়

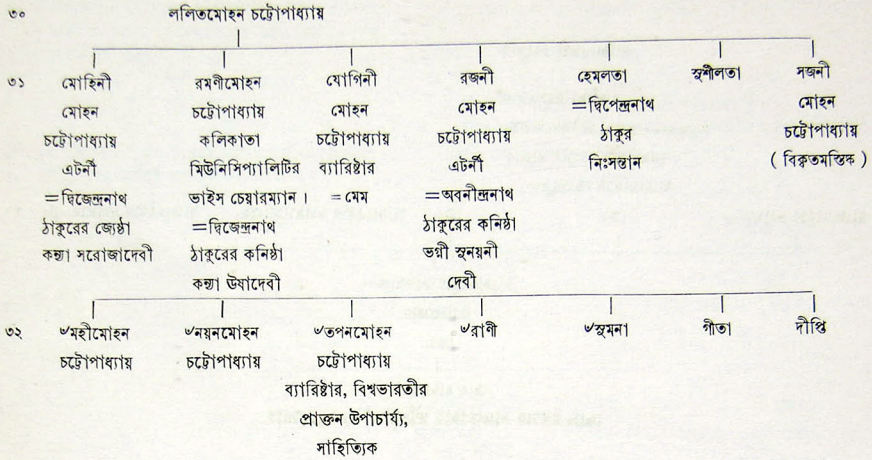

৩০ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩১	মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় এটর্নী =দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজাদেবী	রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান। =দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা উষাদেবী	যোগিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার =মেম	রজনী মোহন চট্টোপাধ্যায় এটর্নী =অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা ভগ্নী সুনয়নী দেবী	হেমলতা =দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃসন্তান	সুশীলতা	সজনী মোহন চট্টোপাধ্যায় (বিকৃতমস্তিষ্ক)
৩২	৺মহীমোহন চট্টোপাধ্যায়	৺নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায়	৺তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য্য, সাহিত্যিক	৺রাণী	৺সুমনা	গীতা	দীপ্তি

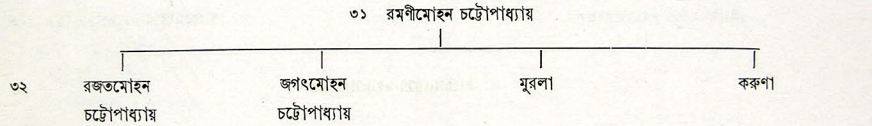

৩১ রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩২	রজতমোহন চট্টোপাধ্যায়	জগৎমোহন চট্টোপাধ্যায়	মুরলা	করুণা

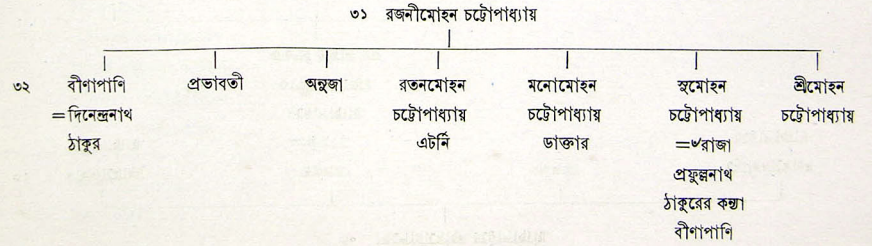

৩১ রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩২	বীণাপাণি =দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রভাবতী	অনুজা	রতনমোহন চট্টোপাধ্যায় এটর্নি	মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার	সুমোহন চট্টোপাধ্যায় =৺রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের কন্যা বীণাপাণি	শ্রীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩০ কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩১ নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় | তরুলতা =ঋষিবর মুখোপাধ্যায় কাশ্মীর রাজ্যের ভূতপূর্ব প্রধান জজ | সরলতা | মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

(তরুলতা ও ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের সন্তান)

৩২ ৺সতীশ মুখোপাধ্যায়
=৺রাজা প্রফুল্লনাথ
ঠাকুরের ভগ্নী
সরলাবালা দেবী

৺যতীশ মুখোপাধ্যায়
=৺রাজা প্রফুল্লনাথ
ঠাকুরের ভগ্নী
রণরঙ্গিণী দেবী

৺রাণী—
=ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ('সাহিত্য' মাসিক পত্রের সম্পাদক) নিঃসন্তান।

৩১ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩২ ৺যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় | ৺অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩২ ৺যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
মৃত্যু — ১৯৩৮
=ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের
পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কনিষ্ঠা কন্যা মতিমালী
মৃত্যু—১৯৩৯

৩৩ ৺ক্ষিতীশপ্রসাদ
চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা কর্পোরেশনের
ভূতপূর্ব এডুকেশন অফিসার,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
নৃতত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব
প্রধান অধ্যাপক
জন্ম — ১৬।১২।১৮৯৮
মৃত্যু — ৩১।৫।১৯৬৩

৺অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
নিঃসন্তান

৩৩ =৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
জ্যেষ্ঠা কন্যা
মঞ্জুশ্রী দেবী
জন্ম—মার্চ ১৯০৭

৩৪ গৌতম চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক
=(১) ৺জয়া দেবী
(২) মঞ্জু দেবী

গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক
=আরতি দেবী

বিভাব চতুর্থ সংখ্যা (১৯৭৭) থেকে পুনর্মুদ্রিত

ভারতের প্রগতি আন্দোলনে হিউম ও হিণ্ডম্যানের ভূমিকা

সুধী প্রধান

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এলেন অক্টেভিয়াক হিউমের ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণভাবে যে ধারণা প্রচলিত তা হিউমের পক্ষে গৌরবজনক নয়-কারণ প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক এবং বামপন্থী ব্যাখ্যাকারদের চোখে তিনি বৃটিশ সরকারের এজেন্ট বা দালাল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ভারতে বৃটিশ শাসনের কঠোরতা ও শোষণের ফলে দেশের মধ্যে যে প্রবল অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছিল—এবং হিউমের মতে যা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের রূপে প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনায় ছিল—তার একটি সংবিধান সম্মত বা গঠনতান্ত্রিক বিকাশের মাধ্যম সৃষ্টি করার জন্য জাতীয় কংগ্রেস গঠনে হিউম উদ্যোগী হয়েছিলেন রজনী পাম দত্ত যাকে সেফ্‌টি ভালভ (safety valve) বলে চিহ্নিত করেছেন। হিউম ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদে চাকুরী করেছেন, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ৭ জন বিদ্রোহীদের ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন এবং ফাঁসির ব্যাপারটি যাতে দ্রুত এবং কম কষ্টকর হয়—তার জন্য নতুন ধরনের ফাঁসি মঞ্চ নির্মাণ করিয়েছিলেন (তাঁর সমসাময়িক প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরাজরা ব্যাপারটি মোটেই পছন্দ করেননি)[১] এবং ভারতে বৃটিশ শাসনযন্ত্রের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের জন্য তাঁকে বৃটিশের পঞ্চমবাহিনীর একজন হিসাবে গণ্য করা এক ধরনের জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী ঐতিহাসিক রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। কেবল হিউম নয়—উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন (যিনি দু'বার জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি হয়েছিলেন) উইলিয়াম ডিগবি ও হেনরি জে. এস. কটন সম্পর্কেও প্রায় সমান সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে —যদিচ তাঁদের রচনা থেকে অজস্র উদ্ধৃতি দিয়ে বৃটিশ শোষণের নগ্ন রূপ তুলে ধরতে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী লেখকরা সক্ষম হয়েছেন। শাসক ও শোষক শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করে বা উক্ত শ্রেণীর প্রভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েও যে কোনো কোনো মানুষ সেইসব শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ থাকলেও ঐতিহাসিকরা সে-কথা মাঝে মাঝে ভুলে যান এবং সহজ ও সরল

সমীকরণের পথ ধরে চলেন। সুখের কথা সম্প্রতিকালে অনেক গবেষক এদেশে এবং বিদেশে পূর্বোক্ত ধরনের ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে ঘটনা ও রটনার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এবং অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান দিচ্ছেন।[২]

বস্তুতঃ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং তার উপরের ভাগ—যাতে ভাবগত বিষয়গুলি (ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, আইন প্রভৃতি) স্থান পায়—তা সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়ে ব্যক্তিমানসের উপর কি প্রভাব বিস্তার করে—নিরূপণ করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। উনবিংশ শতাব্দীর যে যুগে হিউম জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বৃটেনে যেমন নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ (উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ-এর পরিবর্তে) বিস্তার লাভ করছিল—তেমনি ফ্রি ট্রেড (free trade) পন্থী ও Corn law (কর্ণ ল) বিরোধী প্রগতিবাদীদের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রবাদী ভাবধারা ও সংগঠনের সূচনার স্থানও ছিল লণ্ডন শহর। কার্ল মার্ক্সের প্রচেষ্টায় গঠিত শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম আন্তর্জাতিক (ফার্ষ্ট ইনটারন্যাশনাল) যখন ১৮৬৪ সালে গঠিত হয়—তখন হিউম ভারতে বৃটিশ কর্মচারী। হিউমের বাবা যোশেফ হিউম—বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এবং উনবিংশ শতাব্দী দ্বিতীয়ার্দ্ধের একজন খ্যাতনামা প্রগতিপন্থী ছিলেন। বৃটেনের প্রগতিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদী ধ্যান-ধারণার প্রবক্তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক ও বিচ্ছেদের নানা চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে—যার মধ্যে যাওয়ার কোনো সুযোগ এই প্রবন্ধে নেই। তবু আজকের যুগের পাঠকরা মনে করবেন বানার্ড শ'র মতো ফেবিয়ান (Fabian) লেখক ষ্টালিন যুগের সোভিয়েট ইউনিয়নকে সমর্থন করেছিলেন এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির হিণ্ড্যান প্রথমে দাদাভাই নৌরজীর মতো উদারনৈতিক কংগ্রেস নেতা এবং পরে মাদাম কামার মতো সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

কোন গবেষক অবশ্য আজও বলেননি যে হিউম সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছেন। হিউমের বিখ্যাত বিবৃতি যা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাদাভাই নৌরজী প্রভৃতি নেতারা প্রতিবাদ করেছিলেন অত্যন্ত উগ্র বলে—তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়—ইউরোপে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে অধিবেশনের প্রাক্কালে :—

"ভারতের মানুষ অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং কোমল স্বভাবের। নিজেদের সম্রাট এবং উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশকে হত্যা করার দশ বছর আগে ফরাসী দেশেরও মানুষ এমনি ছিল।...ক্ষুধা ও দুর্দশা ভেড়ার পালকে নেকড়ের পালে পরিণত করে-

ছিল।"[৩] ভারত শাসন ও শোষণ সম্পর্কে হিউমের চেতনা বৃদ্ধি পায় তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তিনি ১৮৪৯ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসে ছিলেন এবং রক্ষণশীল মতাবলম্বী বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনকালে উপরওয়ালাদের সঙ্গে রাজনৈতিক মত পার্থক্যের জন্য ১৮৭৯ সালে কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে অপসারিত হন এবং ১৮৮১ সালে সময়ের অনেক আগেই নিজে থেকে অবসর নেন। কিন্তু তিনি সিমলাতে অবসর জীবন-যাপন করছিলেন। ভারতে স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্ত্তনে যখন লর্ড রিপন কিছু উদ্যোগ নেন এবং ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের জাতিবিদ্বেষমূলক আন্দোলন সুরু হয় তখন হিউম পশ্চিমের শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীদের একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনে অগ্রসর হন। হিউম জানতেন ব্যাপারটি ভারতের বৃটিশ শাসন যন্ত্রের বিরক্তির কারণ হবে—তবুও তিনি বড়লাট ডাফ্‌রিনকে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানান এবং বোম্বাইয়ের উদারনৈতিক লাট রীয়ে (Reay)-কে প্রথম অধিবেশনের সভাপতি করার সুপারিশ করেন। বড়লাট ডাফ্‌রিন এই প্রস্তাবে রাজী হননি।

হিউমের পরবর্তী কার্য্যাবলীর বিবরণ এবং তাঁর রচনা ও বক্তৃতাগুলি পড়লে বোঝা যায় যে তিনি বৃটেন ও ফ্রান্সের আর্থ-সামাজিক বিকাশের ধারা অনুসরণ করে ভারতে নেশন-ষ্টেট (nation state) যাতে গড়ে ওঠে এবং ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার মতো বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে তার পক্ষে জমি তৈরী করতে চেয়েছিলেন। এর জন্য তিনি জাতীয় ঐক্য এবং তার ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি মূলক দায়িত্বশীল সরকার গঠন কংগ্রেসের প্রধান কাজ বলে নির্দেশ করেছিলেন (১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে তিনি বলেন যে কংগ্রেসের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত "ভারতের মানুষের মধ্যে যে পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠি আছে তাদের এক জাতিতে পরিণত করা।" তার জন্য প্রয়োজন—"প্রদেশগুলির মধ্যে যে ঈর্ষা, অহেতুক বাচ-বিচার এবং ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান সেগুলির অবসান। সকল মতের, সকল শ্রেণীর, সকল ধর্মের প্রধান ব্যক্তিদের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গোঁড়ামি ও শ্রেণী বৈষম্য ত্যাগ করে সকলের উন্নতির জন্য একটি সংগঠনে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।" হিউম ১০ বছর জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। এই সময় তিনি আঞ্চলিক বিরোধ—বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের অবসান কল্পে অনলস চেষ্টা করে গেছেন। যারা অভিযোগ করেছে কংগ্রেস কেবল রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার কথা বলে—সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির প্রশ্নগুলিকে অবহেলা করে—তাদের জবাবে হিউম বলেছিলেন সাধারণভাবে নৈতিক অবস্থার উন্নতিকে প্রথম

এবং বিদ্যা-বুদ্ধির বিস্তৃত সুযোগ সৃষ্টি করাকে দ্বিতীয় স্থানে রেখে তিনি মনে করেন :

"Only third in importance to my mind is political enfranchisement, but I throw my energies into this latter, firstly because I have read history... and I have come to see that neither moral elevation nor mental culture are nationally possible without some considerable political enfranchisement. There have been periods of intellectual culture as in the Augustan age, accompanied... by political serfdom, but that culture was but the fruit of seed sown.... in an antecedent era of political freedom. You may create the grandest academics. You may found the purest religious sects, but without the infinitely varied inducements to mental exertion and moral restraint afforded by political freedom, your nature will never be either cultured or virtuous".[৪]

রাজনৈতিক স্বাধীনতা আদায়ের উপর অগ্রাধিকার দিয়েও তিনি ভারতের শাসনতন্ত্রে ভারতীয়দের অগ্রাধিকার আদায় করাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আদায়ের প্রথম ধাপ বলে গণ্য করেছিলেন। ১৮৮৬ সালে বেনামা এক প্রচার পুস্তিকায় তিনি লিখেছিলেন যে অ-ভারতীয় যারা এ-দেশের চাকুরী করে—তাদের শতকরা ৯০ জনের পদ ভারতীয়রা নিতে পারে। সৈন্য দলে ইউরোপীয়ান দশ হাজারের সংখ্যা সেই পরিমানে হ্রাস করে ভারতীয়দের নেওয়া যেতে পারে।[৫] পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন : 'আমি সেই সময়ের অপেক্ষা করছি যখন বড়লাট ছাড়া এ-দেশের প্রত্যেকটি সরকারী পদ ভারতবাসীদের দখলে আসবে। এই ব্যবস্থা ক্যানাডাতে চলছে—তখন ভারতের বেলা অন্যথা হবে কেন?'[৬]

ক্যানাডার বড়লাট—নামে বড়লাট, সরকারের নেতা তিনি নন—এবং এই দাবী উত্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতীয় নেতাদের তুলনায় শীর্ষ স্থানে ছিলেন। উত্তর প্রদেশের এটোয়া জেলার শাসক হিসাবে তিনি এদেশের কৃষকদের দুরবস্থার চিত্র অত্যন্ত গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ১৮৭১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যখন 'কৃষি, রাজস্ব এবং ব্যবসাবাণিজ্য' (Agriculture, Revenue and

Commerce) বিভাগ তৈরী করে হিউমকে তার সেক্রেটারী করে দেয়—তখন তিনি কৃষিব্যবস্থাকে আধুনিক করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। সেই পরিকল্পনায় কৃষিকার্যে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, কৃষি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, প্রত্যেক জেলায় একটি বড় সরকারী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং কৃষি বিষয়ক একটি পত্রিকা প্রকাশের সুপারিশ ছিল।[৭] বৃটিশ শাসনে এই ধরনের ব্যবস্থা অকল্পনীয়। কাজেই হিউমের পরিকল্পনাই কেবল ধামা চাপা দেওয়া হ'ল না—গোটা দপ্তরের নাম বদলিয়ে প্রথমে রাজস্ব এবং পরে কৃষি করা হ'ল—পরে জন ষ্ট্রাচি এবং লিটনের পরামর্শে হিউমের মতো 'বিপদজনক' সেক্রেটারীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য গোটা দপ্তরটিই ভেঙে দেওয়া হোল।[৮] হিউমও সহজে ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে তাতে লিখলেন যে ইংরাজ শাসনের প্রধান কলঙ্ক কৃষিকার্যে মৌলিক কোন বিকাশ সাধন করতে উদ্যোগী না হওয়া—যার ফলে দেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ দেখা দিচ্ছে, ঋণের বোঝা, দুর্ভিক্ষ ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। (Agricultural reform in India, London, 1879)।

ইতিমধ্যে এইচ এস হিণ্ড্যানের বহুল প্রচারিত প্রবন্ধ যাতে ভারতে বৃটিশ সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নগ্নরূপ প্রকাশ করা হয়েছিল—তা বৃটেনে ছাপা হয়েছে। রামমোহন, কার্ল মার্ক্স থেকে দাদাভাই নৌরজী ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ Economic drain-এর যে তথ্য সরবরাহ করছিলেন—হিণ্ড্যান *The Bankruptcy of India.* (Nineteenth century No. 4+5 1878-79) মারফৎ বৃটেনের জনসাধারণের সামনে তার সর্ব্বনাশা চিত্র তুলে ধরেন। বৃটেনে সে যুগে হিণ্ড্যান নিজেকে মার্ক্সপন্থী বলে পরিচয় দিতেন। প্রয়াত বন্ধু চিন্মোহন সেহানবীশের কাছে শুনেছি—পূর্ব্ব জার্মানীর হর্ষ্ট ক্রুগারও তাঁর একটি বইয়ে হিণ্ড্যানের মতো সে যুগের ভারতবন্ধুদের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গত বৎসর ইউরোপ সফরের সময় আমি ক্রুগারের সঙ্গে দেখা করবো ভেবেছিলাম, কিন্তু শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় পশ্চিম জার্মানী থেকেই ফিরে আসি। ক্রুগারের বই জার্মান ভাষায় ছাপা হয়েছে।

যাই হোক, একথা মনে করার কারণ আছে যে হিউম এর পর থেকেই বৃটিশ শাসনের অর্থনৈতিক শোষণের চিত্রটিও তুলে ধরেন। পূর্বে যে বেনামা পুস্তিকার কথা লিখেছি তাতে তিনি লিখেছেন যে, শিল্প ব্যবস্থায় যে মুনাফা অর্জিত হচ্ছে এবং যা এদেশের মূলধন গঠনে নিযুক্ত হতে পারতো তা' প্রতি বছর বৃটেনে চলে

যাচ্ছে—ফলে ভারতের দারিদ্র্য দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে "that squalid penury which is everywhere swallowing up our lower classes like a rising swamp, is deepening, widening and blackening."

বস্তুতঃ মার্ক্সবাদী হিণ্ডম্যান তাঁর বইতে (*England for All*, London, 1881 ও *The Bankruptcy of India* London, 1886) যে সকল কথা—যথা বৃটিশ ব্যবসায়ের অতি বৃহৎ যন্ত্র বৃটেনের মূলধনীদের মুনাফার্জনের স্বার্থে ভারতের সমগ্র আয় আত্মসাৎ করছে, প্রভৃতির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় হিউমের রচিত পুস্তিকায়। এই পুস্তিকা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সারা দেশে প্রচার করা হয়। হিউম অবশ্য অবস্থার প্রতিকারের জন্য নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত সরকারের কথাই ভেবেছিলেন—এবং সেই অবস্থা সৃষ্টির জন্য বৃটেনে Richard Colden 'দ্বারা গঠিত Anti-Corn law league-এর মতো ব্যাপক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার স্বপ্নও দেখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—পূর্বোক্ত লীগের ৭ বছর লেগেছিল সফল হতে—কংগ্রেসের হয়তো আরো অনেক বছর লাগবে। তবু যদি 'প্রত্যেক ভারতবাসী মাতৃভূমির উদ্ধারের সংগ্রামে···ন্যায়-বিচার, স্বতন্ত্রতা ও ন্যায্য অধিকারের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাহলে নিশ্চয় সফলতা অর্জিত হবে।' গণ-আন্দোলনই যে ব্যাপক জনসমাবেশ করতে পারে এই বিবেচনা হিউমের ছিল বলে ১৮৮৭-৮৮ সালে তাঁর পরামর্শে জমির মালিকানা আছে এমন ধরনের কৃষকদের জন্য কংগ্রেস ২টি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে।[৯] এইগুলি দশটি সরল ও কথ্য দেশীয় ভাষায় প্রায় ৩ লক্ষ ছাপিয়ে বিলি করা হয়। এরই একটি হিউম নিজে লেখেন। তিনি অবশ্য লিখেছিলেন যে পুস্তিকাগুলিতে 'গরম গরম কথার পরিবর্তে সাধারণ বোধের সুখকর পাঠ' আছে কিন্তু আসলে সেকালের 'বৃটিশ ভারতে বৃটেনের কৃপণ, উদাসীন এবং নিরঙ্কুশ শাসন—যা কেবল রাজস্ব বৃদ্ধি এবং নানারকম কর ভারে ভারতবাসীকে একদিকে শোষণের শেষ স্তরে ফেলে দিচ্ছে এবং একই সঙ্গে আবগারী দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে গ্রামবাসীদের পশু-পালকদের পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে।'[১০] এই পুস্তিকা বিতরণ ছাড়াও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বড়ো বড়ো শহরে সভাসমিতি করে কংগ্রেসের জনসংযোগ বৃদ্ধি করার যে চেষ্টা হয় তাতে হিউম উত্তর ভারতের কয়েকটি সভায় নিজেই বক্তৃতা করেন।[১১] এই ধরনের ক্রিয়াকলাপে বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের উপর কেবল নয় হিউমের প্রতিও রুষ্ট হয়।[১২] গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল এই যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঐসময় হিউম যা করেছিলেন—তিনি তাঁর দৃঢ় সাফাই দিয়েছিলেন—

কিন্তু কংগ্রেসের ভারতীয় নেতারা হিউমকে সমর্থন করেননি বরং শহরে শহরে প্রচার অভিযান বন্ধ করে দিলেন; কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে কংগ্রেসের যা কিছু বক্তব্য তা কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিতেই—নিহিত দুইটি অধিবেশনের মধ্যে কংগ্রেসের পদাধিকারীরা কী করেন বা বলেন তার কোনো দায়িত্ব কংগ্রেসের নেই। পূর্বেই বলেছি যে হিউম কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁরই উৎসাহে পূর্বোক্ত প্রচার পুস্তিকা এবং গণসংযোগ অভিযান শুরু হয়। কাজেই প্রত্যক্ষভাবে প্রচার পুস্তিকা দুটি অস্বীকার না করেও ভারতীয় নেতারা হিউমের গণসংযোগবৃদ্ধিকারী চেষ্টাকে অস্বীকার করলেন ১৮৮৮ সালেই।[১৩] এ দেশের কংগ্রেস নেতাদের কাছে এই ব্যবহার পেয়ে হিউম বৃটেনে ভারতীয় কংগ্রেসের শাখা গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করেন।[১৪]

১৮৯১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিল তাতে ভারতের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য এবং তার ফলে গণবিস্ফোরণের আশঙ্কা আছে এই মর্মে যে কড়া ভাষায় প্রস্তাব গৃহীত হয়—তার রচনায় হিউমের হাত ছিল এবং ঐ বছরের কংগ্রেসের বার্ষিক রিপোর্টের ভূমিকায় হিউম লেখেন—অধিবেশনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—কিসে জনসাধারণের উপকার হয় এবং সব-কিছু ছাপিয়ে এই বিষয়টিই গুরুত্ব পায়।[১৫] ১৮৯২ সালে একটি গোপনীয় ইস্তাহার তিনি সমস্ত কংগ্রেস সদস্যদের কাছে পাঠান যাতে তিনি 'ধনী এবং অবস্থাপন্ন' কংগ্রেস নেতাদের এই বলে সতর্ক করেন যে 'দেশের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ এই শাসনব্যবস্থা ভারতকে এমনি দরিদ্র করছে—যার ফলে বিশ্বের ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ এ দেশেই ঘটতে পারে।'

"ইতিহাস বলে যে জনসাধারণ যতই শান্ত স্বভাবের হোক, এমন সময় আসে যখন অনাহার, অনাচার এবং হতাশা তাদের স্বভাবে নবরূপ পরিগ্রহ করে তাদেরকে হিংসাত্মক ও অপরাধমূলক কর্মে প্রবৃত্ত করায়।··· কোটি কোটি ভারতবাসীর দুঃখের পাত্র আজ কানায় কানায় পরিপূর্ণ এবং প্রতিদিন দারিদ্র্য যা' সকল অরাজকতার জন্মদাত্রী, ক্রমবর্ধমান জনগণের জীবনে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।··· যদি আমরা দরিদ্র মানুষগুলির জরুরী অভিযোগগুলির প্রতিকার না করতে পারি তাহলে রাত্রির পর যেমন দিন আসে তেমনি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করবে।"[১৬]

হিউমের এই সতর্কবাণীর বিপরীত ফল হ'ল। তাঁকে বিলাতে হিণ্ডম্যান এবং

ভারতে বালগঙ্গাধর তিলক সমর্থন করেছিলেন—কিন্তু বৃটেনের ভারতীয় কংগ্রেস এবং ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁর মতামতকে প্রকাশ্য ভাবে নিন্দা করেন। দিনশাওয়াচা পূর্বোক্তদের বক্তব্যকে সংক্ষেপ করে লিখেছেন—"হিউমের উত্তেজক ভাষণ রাজদ্রোহের সামিল" এবং হিউমের "অবিবেচক ও অপরিণামদর্শী কার্যাবলী কংগ্রেসের কণ্ঠনালীচ্ছেদ করার পর্যায়ে পড়ে।"[১৭]

ভারতের কংগ্রেস নেতাদের এই ধরনের সমালোচনায় হিউম দমেননি। তাদের নরমপন্থা, দুটি অধিবেশনের মধ্যেকার সময় কর্মহীনতা ও ভীরুতার প্রকাশ্য সমালোচনা তিনি চালিয়ে গেছেন এবং উক্ত ঘটনার এক বছর পরেও লিখেছেন যে 'প্রত্যেক অঞ্চলের জনসাধারণের বুদ্ধি, উদ্যোগ এবং জ্ঞানকে কাজে লাগাবার মতো ব্যাপক বিস্তার যদি কংগ্রেস না করে তাহলে বর্তমান শাসনব্যবস্থার দ্রুত ও অবশ্যম্ভাবী হিংসাত্মক উচ্ছেদ হবে।' কংগ্রেসকে পূর্ণ রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক নীতি গ্রহণের পক্ষে তৈরি না করতে পারার ব্যর্থতায় তিনি ১৮৯৪ সালে কংগ্রেস সম্পাদকের পদে ইস্তফা দেন এবং শেষবারের জন্য ভারত ত্যাগ করেন। তিনি কংগ্রেসকে দিয়ে ভারতবর্ষের জন্য যা করতে চেয়েছিলেন—তার 'কণামাত্রও' করতে পারেননি এ কথা তাঁর বিদায় বক্তৃতায় ক্ষোভের সঙ্গে প্রকাশ করেন।[১৮] এদেশের কংগ্রেস নেতাদের তুলনায় হিউমের চিন্তাধারা যে পরিমাণে প্রগতিমূলক এবং দ্রুত রূপায়ণে ব্যগ্র ছিল ভারতের নেতারা সেই পরিমাণে সংরক্ষণশীল ও শ্লথগতির পক্ষপাতী ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এক পত্রে হিউম বলেন :

"There are aliens like myself who love India and her children but real work must be done by the people of the country themselves... if fifty men cannot be found with sufficient power of self-sacrifice, sufficient love for and pride in their country, sufficient genuine and unselfish patriotism to take the initiative and if need be devote the rest of their lives to the cause...then there is no hope for India. Her sons must and will remain mere humble and helpless instruments of foreign rulers."[১৯]

১৮৮৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি শিক্ষিত মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হিউম যে গান লিখেছিলেন তাও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সহজ ভাষায় তুলে ধরেছে।

গানটি :

Awake !
Sons of Inde, why sit ye idle,
Wait ye for some Deva's aid ?
Buckle to, be up and doing !
Nations by themselves are made.
What avail your wealth, your learning,
Empty titles, sordid trade ?
True self-rule were worth them all
Nations by themselves...
whispered murmurs darkly creeping,
Hidden worms beneath the shade
Not by such shall wrong be righted !
Nations by themselves....
Sons of Inde, be up and doing
Let your course by none be stayed
Lo, the dawn is in the East,
By themselves are Nations made.

—*Modern Review*, September 1912.

হিউম বিলাতে এসে জাতীয়-কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটি গঠনে মনোযোগ দেন। এই ব্যাপারে উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন এবং দাদাভাই নৌরজীরও বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং ওয়েডারবার্ন আমৃত্যু এই কমিটির সভাপতি রূপে কাজ করেছেন। এই কমিটির কাজের মধ্য দিয়ে বৃটেনের শ্রমিক ও উদারনৈতিক আন্দোলনের কিছু নেতাদের ভারতপ্রীতির নানা দৃষ্টান্ত আছে। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনায় আমরা যে 'বেলাতের ছোটোলোক' থেকে 'বেলাতের বড়োলোকে'র অর্থাৎ উচ্চমনা শিক্ষিত ইংরাজের কথা পাই—ভারত শাসন সংক্রান্ত কাজে আগত কিছু বৃটিশ সিভিলিয়ান—সেই 'বড়ো' ইংরাজের একাংশ। ওয়েডারবার্নের ভারত ও বুয়র প্রীতির জন্য তিনি শেষবয়সে ভোট পাবেন না বলে পার্লামেন্টের সদস্য পদ থেকে সরে দাঁড়ান। হেনরী কটন আসামের কমিশনার ছিলেন, তিনি চা-শ্রমিকদের পক্ষে বিদেশী চা-করদের বিরুদ্ধে যান বলে লর্ড কার্জনের শাসনকালে হিউমের মতো

অসময়ে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। বৃটেনের Independent labour party-র নেতা Keir Hardieও ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পক্ষে বৃটেনে প্রচার করেছেন পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে। লণ্ডনের যে সভায় দাদাভাই নৌরজী প্রথম বক্তৃতা করেন—তিনি তার সভাপতিত্ব করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন অ্যানি বেসান্ত ও তিলক 'হোমরুল' আন্দোলন করছিলেন তখন বৃটেনের শ্রমিক নেতা জর্জ ল্যান্সবেরি বৃটেনস্থ হোমরুল লীগের সভাপতি হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে যেটা মনে রাখা দরকার—নরম-গরম, বিদেশী-স্বদেশী সকলেরই দাবি ছিল—বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ক্যানাডার মতো স্বায়ত্ত-শাসন। হিউমের লেখা—যা আগেই উল্লেখ করেছি—তাতে তিনি সমগ্র শাসন ব্যবস্থা ভারতীয়দের হাতে রেখে নামকা ওয়াস্তে একটি বড়োলাট রাখার প্রস্তাবের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার রূপ দিতে চেয়েছিলেন, এবং কংগ্রেসের ব্যাপক জনভিত্তি তৈরি করে কৃষি ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা যুক্তিসংগত, বিচার সহ ও জনগণের আয়-বৈষম্যের বিরাট পার্থক্যের হ্রাস করার নীতির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথমার্ধে ইউরোপের প্রগতিশীল ব্যক্তি দূরে থাক—সমাজ-তন্ত্রীরা পর্যন্ত পরাধীন দেশ ও উপনিবেশে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলতে চাননি। এই সকল বিষয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যে অধিবেশনে মাদাম কামা যোগ দেন সেই কংগ্রেসে লেনিন ও রোজা লাক্সেমবুর্গ প্রভৃতিকে নিয়ে যে কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটিই প্রথম পরাধীন দেশগুলি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উথাপন করে।

সেই প্রসঙ্গে আপাতত না গিয়ে হিণ্ডম্যানের ভূমিকার আলোচনাতে এই প্রবন্ধ শেষ করব। আমি আগেই বলেছি, হিউম হিণ্ডম্যানের রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। হিণ্ডম্যান সে যুগে নিজেকে মার্ক্সবাদী বলে পরিচয় দিতেন। তিনি কতটা মার্ক্সের ভারত-সম্পর্কিত প্রবন্ধ পড়ে ভারতের বৃটিশ-শোষণ সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন জানা যায়নি কিন্তু তিনি দাদাভাই নৌরজীর প্রবন্ধগুলি ছাড়াও James C. Geddes নামে একজন তরুণ আই. সি. এস.-এর লেখা : *The Logic of the British deficit* (London 1871) পড়ে উৎসাহিত হন। Geddesও কটনের মতো positivist দর্শনের ভক্ত ছিলেন এবং অত্যন্ত তীব্র ভাষায় বৃটিশ রাজত্বের ভারতের অর্থনৈতিক শোষণের বর্ণনা দেন। নৌরজীর *The Poverty* of India—১৮৭৭ সালে গেড্‌স-এর বইয়ের পরিপূরক হিসাবে দেখা দেয়।

হিণ্ডম্যান নৌরজী-প্রদত্ত তথ্য ও যুক্তিতে মুগ্ধ হন এবং শীঘ্রই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। হিণ্ডম্যানের রচনাগুলি বৃটিশ ভারতের স্বদেশী পত্র-পত্রিকায় বিশেষ

প্রশংসা পায়। কিন্তু যখনই তিনি তন্নিষ্ঠ সমাজতন্ত্রবাদী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন থেকে ভারতের কংগ্রেস তাঁকে অবহেলা করতে আরম্ভ করল—কারণ কংগ্রেসের নেতারা ধনতান্ত্রিক এবং তাঁরা শ্রেণী-সংগ্রাম যে পছন্দ করবেন না—জানা কথা। বস্তুত হিউমের ব্যাপারেও আমরা দেখেছি—কংগ্রেসকে জন-ভিত্তিক করা এবং কৃষকদের উন্নতি করার ব্যাপারে তাঁদের যথেষ্ট অনীহা ছিল। এই কারণে হিণ্ডম্যানকে বিলাতে কিংবা ভারতে কংগ্রেসের কোনো অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হয়নি যদিও তিনি একাগ্রচিত্তে ভারতের পক্ষে প্রচার করেছেন।

কারণ মার্ক্সবাদী হিণ্ডম্যানের ক্রমশ এই ধারণা বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্ভব নয়। ১৮৮৪ সালেই সোশাল ডেম-ক্রাটিক ফেডারেশনের সাপ্তাহিক 'জাষ্টিস' কাগজে তিনি হিউমের এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে লিখছিলেন—ভারতের 'ধ্বংসোন্মুখ জনসাধারণের বিদ্রোহ' শুরু হওয়ার মুখে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অসহ্য অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ 'অভ্যুত্থান'—(insurrection)।[২০] এর প্রায় দশ বছর পরে পশ্চিম ভারতে দুর্ভিক্ষ, প্লেগ এবং চাপেকর ভ্রাতাদের দ্বারা রাজনৈতিক হত্যা সংগঠিত হয়—হিণ্ডম্যান তখন তাঁর 'জাষ্টিস' পত্রিকা মারফত ভারতে বিদ্রোহ ঘটাবার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন।[২১] হিণ্ডম্যানের এইসব রচনা বৃটেনও ভারতের শাসককুলের বুকে কাঁপুনি সৃষ্টি করে। এমনকি দাদাভাই নৌরজী পর্যন্ত এমনি ভীত হন যে তিনি হিণ্ডম্যান ও সোশাল ডেমক্রাটিক ফেডারেশনের সঙ্গে আর একত্র কাজ করতে পারবেন না বলে সংবাদ পাঠান।[২২] উত্তরে হিণ্ডম্যান কংগ্রেসের সমগ্র নরমপন্থী গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং ১৮৯৮ সালে লেখেন : "আপনাদের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিরা নরমপন্থায় কী লাভ করছেন? আপনাদের পত্রিকা 'ইণ্ডিয়া'র বোকা বোকা প্রবন্ধ কী আদায় করছে··· ? খোলা চোখ, এমনকি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলেও জানা যায়—কিচ্ছু না। তারা (শাসক শ্রেণী) আপনাদের সম্পর্কে মিথ্যা বলে, লাথি মারে এবং রাজদ্রোহ নিবারক অনেক আইন প্রণয়ন করে যার সংখ্যা আমাদের দেশের থেকে অনেক বেশি। আমাদের অন্তত এই সান্ত্বনা যে আমরা তাদের তাড়া করতে পারি, নিন্দা করতে পারি, হাস্যাস্পদ করতে পারি যার ফলে তারা রাগে গরগর করতে থাকে। তাছাড়া আমরা এখন অবশ্যম্ভাবী সংকটের (ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট / আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ—স্ব.প্র. ?) জন্য তৈরি হচ্ছি—যা কেবল ভারতেই ঘটবে না।" কংগ্রেসের গরমপন্থীরা প্রায় দশ বছর পরে (সুরাট কংগ্রেসে) যা' বলেছিলেন—হিণ্ডম্যান তার আগেই তা'

বলেন এবং এদেশের কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়েন। ফলে হিণ্ডম্যান বিলাতস্থ ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে ১৯০৫ সালের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

১৯০৪ সালে আমস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্ব-সম্মেলনে হিণ্ডম্যান দাদাভাই নৌরজীকে নিয়ে যান এবং ভারত সম্পর্কে একটি প্রস্তাবও ঐ কংগ্রেসে পাস করান। এই কংগ্রেসে আমেরিকার সোশালিস্ট লেবার পার্টির প্রতিনিধিদলের নেতা Daniel Debcon-এর রচনা "Flash light of the Amsterdam Congress(1904)" ঐ যুগের সংস্কারপন্থী ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে নিজের মুখোসও খুলেছেন—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিণ্ডম্যানের ভারত সম্পর্কে আন্তরিকতাও প্রকাশ করে ফেলেছেন :

"...Hyndman, with India on the brain, is too dull to understand the supreme importance of the sessions of the international political policy, fumes at the Committee's attracting the bulk of the delegates from the sessions of the Congress, goes about like a setting hen with the pitiful Dadabhoy Nauroji under his wings unable for lack of an audience to get the latter to cackle his piece and finally unable to contain himself any longer turns the rump of the Congress into a clime museum with the wailing croak of his Hindoo."

মনে রাখতে হবে ভারতে ইউরোপের মতো সে যুগে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন ও নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। কাজেই সমাজতন্ত্রবাদের ধ্যান-ধারণার প্রশ্নও ওঠে না। কিন্তু ভারতে উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রধান নেতা দাদাভাই নৌরজী সঠিকভাবেই ইউরোপ-আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতন্ত্রী দলের কাছে ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি তুলেছিলেন—যা লেনিন কর্তৃক তৃতীয় বা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক তৈরি হওয়ার আগে প্রকৃত সমর্থন পায়নি। অথচ সেদিন দাদাভাইদের যে দু-কূল রাখার চেষ্টাতে হিউম ও হিণ্ডম্যানদের পরিত্যাগ করতে দেখা যায়—সে দোদুল্য-মানতা কি আজও কেটেছে?

যাই হোক—হিণ্ডম্যান দাদাভাইদের ছেড়ে লণ্ডনপ্রবাসী বিপ্লবী শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্মাদের সাহায্য করতে লাগলেন। তাঁরই উৎসাহে কৃষ্ণ বর্মা *Indian Sociologist* পত্রিকা প্রকাশ করেন—কৃষ্ণ বর্মার লণ্ডন হোটেল, যেখানে ভারতের

বিপ্লবী ছাত্ররা থাকতেন সেইখানে ইণ্ডিয়া হাউস পত্তনে সাহায্য করেন। এরপর তিনি ১৯০৭ সালে স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সভায় মাদাম কামাকে বলার সুযোগ করে দেন। এই কংগ্রেসে কামা লেনিনকে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তাবে কমিটির নেতা হিসাবে দেখে ভরসা পান। এই কংগ্রেসেই বৃটেনের সোশাল ডেমক্রাটিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে হিণ্ডম্যান "The ruin of India by British rule" শীর্ষক একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট এমনই আক্রমণাত্মক ভাষায় ছিল যে পুস্তিকা-কারে প্রকাশিত হলে বৃটিশ সরকার তার উপর এবং হিণ্ডম্যানের 'জাস্টিস' সাপ্তাহিকের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারী করে। ১৯০৯ সালে মিণ্টো সাহেব মর্লেকে দিয়ে ঐ নিষেধাজ্ঞা চিরস্থায়ী করেন এই কারণে যে 'বৃটিশ শাসন সম্পর্কে হিণ্ডম্যানের সমালোচনা শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্মার সমালোচনার তুলনায় কিছু কম নয়—কিন্তু হিণ্ডম্যান একজন বৃটিশ জননেতা হিসাবে যে সকল উক্তি করছেন—তা ভারত সম্পর্কে অজ্ঞ বৃটিশের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।'[২৩]

হিণ্ডম্যান অবশ্য পরে হিংসাত্মক বিপ্লবের পথ থেকে সরে এসে কংগ্রেস-মুসলীম লীগ ঐক্যের যে চেষ্টা ১৯১৬ সালে হয়েছিল—তার পক্ষে গিয়েছিলেন, তবু ১৯২১ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ঐ পুস্তিকার উপর নিষেধাজ্ঞা ওঠেনি। তাঁর ভারত সম্পর্কে যত রচনা বাজেয়াপ্ত হয়েছে, অন্য কোনো ইংরাজের তত লেখা হয়নি।

হিণ্ডম্যানের মার্ক্সবাদবোধ এঙ্গেল্‌সের বিচারে ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং এঙ্গেল্‌সই প্রথমে এই বিষয়ে বৃটেন ও ইউরোপীয় মার্ক্সবাদীদের সতর্ক করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যে-সকল সমাজতন্ত্রীরা নিজ নিজ দেশের সরকারকে সমর্থন করে-ছিলেন. হিণ্ডম্যান তাদের একজন এবং বৃটেনের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে সমর্থন করায় তাঁকে মন্ত্রীসভাতেও নেওয়া হয়। তাই তৃতীয় বা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার পর ইউরোপের কমিউনিস্ট ও সোশালিস্টদের মধ্যে যে পার্থক্য ও বিরোধ শুরু হয়—হিণ্ডম্যান তার ফলে তীব্র কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী হন। বোধকরি এই কারণে বাম-পন্থী ঐতিহাসিকরা হিণ্ডম্যানের ভারতবর্ষীয় ক্রিয়াকলাপের উপর গুরুত্ব দেননি। আমি আগেই বলেছি সে-যুগের জাতীয় নেতৃত্ব যেমন ইংরাজের অধীনে স্বায়ত্ত-শাসন চেয়েছিলেন, তেমনই উপনিবেশ-দমনকারী ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ-গুলির সমাজতন্ত্রীরাও মনে করতেন অনুন্নত দেশগুলির উন্নতির জন্য ইউরোপের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত—যাকে সাম্রাজ্যবাদের ভাষায়

White man's burden-এর এপিট ওপিট বলা যায়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক পরাধীন জাতির উন্নতি বুর্জোয়াদের প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদের সম্পর্কে যথেষ্ট ভয় ছিল। কেবল দাদাভাই নৌরজীদের মতো নেতা নয়—সুভাষচন্দ্রের মতো বামপন্থী নেতারও ধারণা ছিল—আগে স্বাধীনতা এবং পরে শ্রেণীসংগ্রাম। গত বছর পশ্চিম জার্মানীর পররাষ্ট্র দপ্তরের মহাফেজখানায় ভারতস্থ জার্মান কুটনীতিবিদদের গোপন রিপোর্ট দেখলাম, যাতে সুভাষচন্দ্র-পরিচালিত 'ফরোয়ার্ড' কাগজের অনেক কাটিং রক্ষা করা আছে। এই কাটিংগুলির কোনো কোনো অংশে বলা আছে—আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ভারতে শ্রমিকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ-বিরোধী মনোভাব তৈরি করছে; বিশেষ করে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক-সংস্থাকে সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিকও বলা হয়েছে—সঠিকভাবেই। যে পাবলিক সেফটি বিলের প্রতিবাদে ভগৎ সিং প্রমুখ ভারতীয় আইন সভায় বোমা ফেলেছিলেন—সেই বিল সম্পর্কে জার্মান কুটনীতিবিদের মন্তব্য ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই মন্তব্যের তারিখ ২১ মে ১৯২৯ সাল।

"ভগৎ সিং-রা যে প্রচার পুস্তিকা আইন সভায় বিলিয়েছেন তাতে বোঝা যায় এরা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে ভারতের মতো মহাদেশে যে পরিমাণে অনৈক্য এবং ভারতবাসীরা যে পরিমাণে অলস তাতে ভারতে সাম্যবাদের সাফল্যের জন্য বহুকাল অপেক্ষা করতে হবে। ইংরাজদের সে ভয় বড়ো একটা নেই—তবু তারা কমিউনিস্টদের সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক।"

মোটের উপর হিউমের বক্তব্যের মর্ম যদি কেউ সঠিকভাবে বুঝে থাকেন তা হ'ল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের গণভিত্তি যেমন বাড়িয়েছিলেন—তেমন কৃষক আন্দোলনকে জাতীয় নেতৃত্বের তাঁবে রাখতে নানা কৌশলও বাৎলিয়েছিলেন। অপর পক্ষে হিণ্ড্যানের insurrectionary মতবাদ রাসবিহারী বসু, যতীন মুখার্জী প্রমুখ জাতীয় বিপ্লবীরা গ্রহণ করলেও তাঁদের পিছনে জনমত না থাকায় তাঁরা অসফল হলেন। তাঁদের দলের নরেন ভট্টাচার্য মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম জন্মদাতা হলেন। হিণ্ড্যান যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মেলালেন তেমনই অনেক বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীও গান্ধীজির নির্দেশিত পথে কমিউনিস্ট বিরোধিতার রাজনীতিতে শেষ জীবন কাটিয়েছেন। জার্মান কুটনীতিবিদ ১৯২৯ সালে যা বলেছিলেন—তার তুলনায় ভারতের অনৈক্য আরো বেড়েছে এবং ভারতবাসীদের সক্রিয়তা কী পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে—তার সঠিক হিসাব না দিয়েও উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ

ভারতের অবস্থা দৃষ্টান্তে একথা বলা যায় যে আরো অনেকদিন সাম্যবাদী আন্দোলনের কর্মীদের অনেক ঘাম, অনেক রক্ত ও অশ্রুপাতের মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে।

তথ্যপঞ্জি

1. India-Britannica, p. 198 by Geofrey Moorhouse, Willam Collin Sons & Co. LTD. London 1983
2. Indian National Congress and British Radicalism by E. C. Moulton, Dept of History, University of Manitoba, Canada (un-published theses in 1985)
3. William Digby, A. B. Patrika 1892, quoted by C. Sehanobis in Socialism and India, Shahid Prakashan 1976
4. Hume to Tyabji—13 September 1888, Tyabji Papers
5. The Old Man's Hope—Calcutta 1886
6. Public Service Commission Vol. 8. 1887
7. Hume, minute, 25 August 1871. Govt. of India Revenue Dept. Papers on Agriculture, 1868-79 (India office-library)
8. Lytton to Eden, 10 May, 1879, Lytton papers 51814
9. Indian Nationalism and the early Congress, J. R. Mclane (Princeton 1977)
10. Ripon Papers, INC reports 1887
11. *Ibid.*
12. B. Martin, New India 1885, Bombay 1971 and Mclane and Moulton, *loc. cit.*
13. The emergence of Indian Nationalism—Anil Seal, Cambridge 1966, p. 294
14. H. P. Kaushik. The Indian National Congress in England (1885-1920), Delhi 1970

15. The Encyclopaedia of the INC Vol. 2 (1891-95) Ed. A. M. and S. Zaida, New Delhi 1977
16. Hume to every member of the Congress Party 16 February, 1892, India, 13 May 1892
17. Wacha to Dadabhoy 19 March, 2 April, 1892, Dadadhoy Nauroji Correspondence, pp. 281-94, Bombay 1977
18. Hume to B. N. Pandit, 24 February 1892, India, 13 May 1892. Hume : The Truth about India : India, September 1893. Hume's Farewell to India—India, London 1894
19. India-Britannica—Geofrey Moorhouse *op.cit.*
* হিউম ছাত্রদের বলেছিলেন অল্পবয়সে বিয়ে না করতে। ছেলে-মেয়ে উভয়কে লেখাপড়া শিখতে, যা বলবে তা করবে—অর্থাৎ কথার দাম দিতে এবং বিদ্বেষ ভাব থেকে মুক্ত থাকতে, কারণ এই একটা মনোভাব যা ঐক্য-বদ্ধ কাজের প্রধান বাধা। (মডার্ন রিভিউ, ১৯১২)
20. *Justice*, 23 August and 11 October 1884
21. *Ibid.* 20 March, 10 and 17 July 1897
22. R. P. Masani : Dadabhoy Nauroji (London 1939), p. 400
23. Viceroy to Secretary of State, 27 May 1906, Govt. of India, Home Dept Pros-Pol (June 1909, p.36)
* এই প্রবন্ধটির জন্য Edward C. Moultor-এর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা এবং লোকসাহিত্য

পল লেভিন

সাহিত্য রচনা এবং টিঁকে থাকা—এ দুয়ের যোগাযোগ নিয়েই আমি শুরু করছি। যে টিঁকে যায়, সমসাময়িক চিন্তায় অবশ্য তাকে সর্বত্র দেখা যাবে। রবার্ট জে. লিফ্‌টন যেমন বলেছেন, এই নিশ্চিহ্নতার যুগে রক্ষা পাওয়া ব্যক্তিটি হল সর্বজনের প্রতিভূ। লিফ্‌টন এই বলে যুক্তি দিয়েছেন যে আমরা সকলেই হিরোশিমার, এবং আমাদের কল্পনায় ভবিষ্যৎ পারমাণবিক বিপর্যয়ের থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। হিরোশিমা এবং আমাদের যোগাযোগ শুধু আলঙ্কারিক নয়, বরং বিশিষ্ট মানসিক উপাদানে সম্পৃক্ত, যেটা এইরকম রক্ষা-পাওয়া মানুষের সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের দিক থেকে অনুসন্ধানযোগ্য।

হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে যারা রক্ষা পেয়েছে, তাদের সম্বন্ধে 'ডেথ ইন লাইফ' গ্রন্থে লিফ্‌টন যে প্রণালীতে মানুষ রক্ষা পায় এবং সেইসূত্রে আবেগ-জনিত যে জটিলতা দেখা দেয়, এ দুটোই বর্ণনা করেছেন। প্রথমটিকে তিনি বলেছেন 'মানসিক স্থবিরতা—যার ফলে মানুষ যাতে বাঁচতে পারে এমন অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। একজন জাপানী পদার্থবিদ, যিনি ঐরকম ভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন —তিনি যখন তাঁর আত্মীয়দের দেহ খুঁজে বার করবার জন্য একটা সপ্তাহ রাশি রাশি মৃতদেহের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, তাঁর তখনকার স্থবিরতার অভিজ্ঞতা তিনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন—

'যতই আমি হেঁটে হেঁটে এগোচ্ছিলাম, ততই এসব বীভৎস বস্তু আরো প্রকট এবং আরো অসহ্য হয়ে উঠছিল। একটা সময়ে আমি নিশ্চয় অল্পবিস্তর বোধের সীমায় পৌছে গিয়েছিলাম, যেজন্য চারপাশে যা দেখছিলাম সে সম্বন্ধে কোন অনুভূতিই হচ্ছিল না, আসলে আমি অসাড় হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয় মানুষের অনুভূতি একটা অবস্থার পরে আর সম্প্রসারিত হতে পারে না—খানিকটা ছবি তোলার মতো হয় ব্যাপারটা। যদি কোন বিশেষ অবস্থায় আপনি একটা ছবি তোলার প্লেটকে আলোর সামনে রাখেন, ওটা কালো হয়ে যাবে—কিন্তু যদি আলোটা লাগিয়েই যেতে থাকেন, তখন এমন একটা অবস্থা আসে যখন এটা

সাদা হয়ে যায়··· কেবল অনেক পরেই বোঝা যায় যে আমরা ঐরকম চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছি।···'

কিন্তু মানসিক স্থবিরতার মূল্য হিসেবে দিতে হয় আবেগ, কারণ টিঁকে থাকার জন্য আমাদের নৈতিক শিক্ষাকে অস্বীকার করার মতো কঠিন কাজটা করতে হয়। নাগাসাকির বিস্ফোরণের ভয়াবহতার পরে যিনি বীরত্বের ভূমিকা নিয়েছিলেন এমন একজন ক্যাথলিক চিকিৎসক দেখিয়েছেন যে জীবিতাবশিষ্টরা কেমনভাবে যন্ত্রণায় দীর্ণ বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের এড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। 'সংক্ষেপে বলতে গেলে, যারা বোমার ধাক্কা সামলে টিঁকে গিয়েছে, তারা শুধু ভাগ্যবান তা-ই নয়, কমবেশি স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, সভ্যতার পরিবর্তে প্রবৃত্তি দ্বারাই চালিত···আমরা যারা টিঁকে গেছি, তারা জানি এটা। এই জানাটা একটা চিন্‌চিনে ব্যথার মতো সর্বদাই লেগে থাকে।'

তাহলে এইরকম রক্ষা পাওয়া জীবিত মানুষটি হল দোটানায় আবদ্ধ একটি চরিত্র। বেঁচে যাবার জন্য বলা চলে যে তার বরাত ভাল, কিন্তু ঐ বরাতই তাকে তাড়না করে। কারণ তার মনে হয় যে সে অন্য কারো জীবনের মূল্যে বেঁচে রয়েছে। হিরোশিমার একজন রক্ষা পাওয়া মানুষ এইভাবেই বলেছে—'আমি বেঁচে আছি বলে যারা মারা গেছে তাদের জন্য আমি দুঃখিত।' লিফ্‌টনের মতে, 'যে বেঁচে আছে, কখনোই ভেতরে ভেতরে এটা মেনে নিতে পারেনা যে অন্যরা নয়, তার পক্ষেই বেঁচে থাকাটা সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত। বরং সে একটা সামাজিক তুলাদণ্ডের অচেতন উপলব্ধিতে তাড়িত হয়, যাতে তার মনে হতে থাকে যে অন্যের মৃত্যুতেই তার বেচে থাকা সম্ভব হয়েছে—অন্যরা যদি না মরতো, তাহলে তাকেই মরতে হতো; যদি সে না বাঁচতো, তবে অন্য কেউ বাঁচতো। বেঁচে থাকার অগ্রাধিকারের সঙ্গে যুক্ত এই অপরাধবোধ মানবিক অস্তিত্বের মৌলিক ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।'

লিফ্‌টন এই সর্বব্যাপী অপরাধবোধকে বলেছেন 'শনাক্তকরণের অপরাধ' যারা বেঁচে আছে তারা এর সাহায্যে তাদের বদলে যারা মারা গেছে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। তাঁর মতে, এই অপরাধবোধটা অভিঘাতের জায়গা থেকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে যায়। 'মৃতদের থেকে সরে এসে, মৃত্যুতে লীন হবার কেন্দ্র থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে—প্রতিটি গোষ্ঠীই মর্মে মর্মে সেই যন্ত্রণা অনুভব করে যা তাদের নিজেদের উপলব্ধি থেকে একধাপ বেশি গভীর এবং যার সঙ্গে নিজেদের অবস্থার তুলনা করে অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান মনে করা যায়।' এইভাবে,

তাৎক্ষণিক রক্ষা পাওয়া মানুষটি মৃতের সঙ্গে একাত্ম হয়, আর যাদের বিপর্যয়স্থল থেকে দূরে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে তারা নিজেদের রক্ষাপ্রাপ্তদের উত্তরাধিকারী বলে মনে করে। 'বাইরে এই ছকটা যতই অদৃশ্য থাকুক, একদলের সঙ্গে অন্য-দলের আচরণেই ব্যাপারটা টের পাওয়া যাবে', এই বলে লিফ্‌টন সিদ্ধান্ত করেছেন। 'তাদের অস্তিত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এই শনাক্তকরণের সঙ্গে যে অপরাধ-বোধ জড়িয়ে রয়েছে সেইটিই সকল মানবিক আচরণের চূড়ান্ত প্রতীকী সংযোগের জরুরী ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।'

কিন্তু যদি এই অপরাধগুলি সংহত হয় অথবা যদি বিপরীতে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে কি হতে পারে? নিপীড়নের অনুভূতি এবং নির্দোষীর শপথ? আর যদি এই সংহতি বা বৈপরীত্য কেবল ব্যক্তিগত স্তরে না ঘটে সমষ্টিগত স্তরেও ঘটে, তাহলেই বা কি হয়? 'ইন্‌এবিলিটি টু মোর্ন'-এ দুজন জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ্ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে পশ্চিম জার্মানীর অধিবাসীদের সমষ্টিগত আচরণ পরীক্ষা করে দেখেছেন। লিফ্‌টন যেখানে জাপানের সর্বত্র—এবং অন্যত্রও—একটি শনাক্তকরণের অপরাধবোধ পরিব্যাপ্ত হতে দেখেছেন—বিপরীত পক্ষে আলেকজাণ্ডার এবং মার্গারেট মিট্‌শারলিক যুদ্ধপরবর্তীকালে পশ্চিম জার্মানীতে কোন অপরাধবোধ বা শোক প্রকাশের সামর্থ্য দেখেননি। 'শোক একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে কেউ তার ক্ষতিকে সামাল দিতে পারে', বলছেন এঁরা '···কারো শোক প্রকাশে বাধা ঘটলে তার মানসিক উন্নতি, তার মানবিক সম্বন্ধ, তার স্বতঃস্ফূর্তি এবং তার সৃজনশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়।' কিন্তু এর বদলে এঁরা দেখেছেন নাৎসীযুগের ঘটনার মোকাবিলা করা বা সেইসবের জন্য দায়িত্ব স্বীকার করার যৌথ অক্ষমতা। শোকের এই অক্ষমতা—যা কোন অপ্রীতিকর বা গভীর দুঃখের অভিজ্ঞতাকে অবরুদ্ধ করে দেয়—একটি মানসিক বিশৃঙ্খলার চিহ্ন। কিন্তু আশ্চর্য, এটি কোন গতানুগতিক মানসিক অসুস্থতার মতো দেখায় না। বাস্তবিক পক্ষে, যুদ্ধপরবর্তী জার্মান সমাজের মসৃণ চেহারা, মানসিক বিশৃঙ্খলা প্রকাশের অভাব—এগুলি দেখেই লেখকরা নাৎসী অতীতের যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাজ করে যাওয়া এবং এই যন্ত্রণাকে সমবেতভাবে মোকাবিলা করার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। 'সাম্প্রতিক কালে মানসিক বা শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রায় ৪০০০ রোগী হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনঃসমীক্ষণ কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য এসেছিল। সেখানে এদের সম্বন্ধে লেখা বিবরণ থেকে তাদের লক্ষণের সঙ্গে নাৎসীযুগের অভিজ্ঞতার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। অতীতের বোঝাটা

এমন নয় যেটা শুধু মানসিক লক্ষণের সাহায্যে বিচার করা চলে', এই হল তাঁদের সিদ্ধান্ত। 'স্বাভাবিক উপায়ে সামলানো যায় না এমন কোন মানসিক চাপের বহিঃপ্রকাশ এতই সামান্য ছিল যে অনেকের মনে হতে পারে জার্মানীতে কখনোই নাৎসী প্রতাপ ছিল না এবং ১৯৪৫ সালে, খুব জোর বলতে গেলে দেশ থেকে একটি নাৎসী গোষ্ঠী খতম হয়ে গেছে যারা, বলতে হয়, বিদেশী 'দখলদার' ছিল।'

মানসিক স্থবিরতা, শনাক্তকরণের অপরাধ, শোক প্রকাশের অক্ষমতা,—সংক্ষেপে বললে, কোন একটি বিপর্যয়ের থেকে বেঁচে গেলে যে জটিল অনুভূতি হয়—সেগুলো সবই আমরা দেখতে পাবো, ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতায় জড়িত আছে।

কারণ সাম্প্রতিক আমেরিকার ইতিহাসে ভিয়েতনাম একটি বিরাট অভিঘাত এবং তার পরবর্তীকালে যা কিছু ঘটেছে, তা কোন-না-কোন উল্লেখযোগ্য মাত্রায়, এর দ্বারাই গড়ে উঠেছে। নর্মান মেইলারের যুদ্ধবিরোধী উপন্যাস 'হোয়াই আর উই ইন ভিয়েৎনাম' থেকে শুরু করে নর্মান পোডহোরেজের যুদ্ধের স্বপক্ষের আলোচনা 'হোয়াই উই ওয়্যার ইন ভিয়েৎনাম' পর্যন্ত—ভিয়েৎনামের অভিজ্ঞতা কি, কি এর অর্থ—এসবই পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার বিষয় হয়ে উঠেছে। স্পষ্টত, ঘটনাগুলি নিজেদের ব্যাখ্যা দেয়নি। 'ক্রমবর্ধমানভাবে, ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের পটভূমি থেকে আমেরিকান লেখকেরা তাদের কল্পনার চোখ দিয়ে এইসব ঘটনাকে আলোকিত করতে চেয়েছেন। ভিয়েতনাম অভিজ্ঞতার ওপরে ক্রমাগত কল্পনার যে পুনর্দর্শন চলছে, সেইটিই হল আমাদের আজকের বিষয়।

গোড়ায় আমাদের ভিয়েতনাম অভিজ্ঞতার মূলে ছিল প্রকৃত ঘটনা, অন্তত আমরা তাই জানতাম। ষাটের দশকে সাংবাদিক বিবরণ, সংবাদ প্রতিবেদন এবং চলচ্চিত্রের টুকরো—এইসবেই ভিয়েতনাম সম্বন্ধে ধারণা প্রভাবিত হতো। সাংবাদিক, ঐতিহাসিক এবং সেইসঙ্গে ভিয়েতনামে আমেরিকার উপস্থিতির সমর্থক এবং সমালোচক, এরাই ভিয়েতনামের ব্যাপারে আদি সাহিত্য নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু কখন একটি ঘটনাকে আমরা ঘটনা বলব না? কেনেডি এবং জনসনের অধীনে আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট ম্যাকনামারা ছিলেন নিয়মতন্ত্রের পরিচালক এবং ঘটনার বিশ্লেষণের ক্ষমতার জন্য তিনি নিজে গর্বিত হতেন। বাস্তবতার সঠিক পরিমাপের জন্য পরিসংখ্যানের উপর ম্যাকনামারার নির্ভরতা ছিল প্রবাদ-প্রতিম। যখন তিনি প্রথমবার ভিয়েতনাম পরিদর্শন করে ফিরলেন তখন তিনি বলেছিলেন, 'প্রত্যেক পরিমাণগত হিসাবেই দেখা যাচ্ছে যে এই যুদ্ধে আমরা জিতছি।' যেহেতু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁর কোন নিজস্ব পন্থা

ছিল না, তাঁকে দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের দেওয়া তথ্যের উপরে বাধ্য হয়ে নির্ভর করতে হয়েছিল। একজন ভিয়েতনামী সেনানায়ক বলেছিলেন, 'আঃ পরিসংখ্যান। তোমাদের প্রতিরক্ষা সচিব পরিসংখ্যান ভালবাসেন। তিনি যা যা চান সবই—আমরা দিতে পারি। তুমি যদি চাও সেগুলো ঊর্ধ্বমুখী হোক, তবে তাই হবে। যদি চাও যে তারা নীচের দিকে যাবে, তবে তা-ও হবে।' (বারিংজ, ১১৭তে উদ্ধৃত।)

কিন্তু ম্যাকনামারা কেবলমাত্র বানিয়ে তোলা পরিসংখ্যানের বলি হয়েছেন তা-ই নয়, তিনি উপন্যাসকেও ঘটনা বলে চালিয়েছেন। 'দি বেস্ট অ্যাণ্ড দি ব্রাইটেস্ট' গ্রন্থে ডেভিড হ্যালবার্স্টাম একটি ঘটনা বিবৃত করেছেন যেখানে ম্যাকনামারা জাতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের সভায় তাঁর আক্রমণাত্মক নীতির সমালোচকদের কিন্তু পরিসংখ্যান শুনিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন। পরে জানা গিয়েছিল যে সেগুলো তিনি ঐখানেই বানিয়েছিলেন। আত্মঅহঙ্কারের ফাঁদে অবশ্য কেবল আমেরিকানরাই পড়েছিলেন এমন নয়। একজন পর্যবেক্ষক বলেছেন—

> যেহেতু আমেরিকানদের মৃত্যু আমাদের কাছে বিশেষ জরুরী ছিল, সেইজন্য আমরা শত্রুদের মৃতদেহের গণনা শুরু করলাম। কিন্তু গরীব দেশ বলে উত্তর ভিয়েতনাম—(বাকী পৃথিবীর চেয়ে জীবনকে কম দাম দিত বলে নয়)—যা তাদের নেই এমন প্রযুক্তিবিদ্যার বদলে জনসংখ্যার উপরে নির্ভর করতে বাধ্য হতো। নিজেদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে উত্তর ভিয়েতনাম যন্ত্রপাতি আর প্রযুক্তিবিদ্যাকে এতটাই দাম দিত যে আমাদের যেসব যন্ত্র তারা ভেঙেচুরে দিয়েছে, সেগুলোই গুনত। ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতির হিসেবটাই তারা রাখত। তাদের অল্পস্বল্প লগ্নীর তুলনায় আমাদের কত টাকা খরচ আর নষ্ট হচ্ছে, তার একটা তুলনামূলক হিসেব করত ওরা। দুপক্ষই অন্যের ক্ষতির হিসেব রাখত নিজেদের জরুরী শর্তানুযায়ী, অন্যের শর্ত মতো নয়। (বারিংজ, ২৪৯)

ঘটনা এবং কল্পনার বিভ্রান্তি থেকে বোঝা চলে যে ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা সাংবাদিক এবং ঐতিহাসিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। সত্তর দশকের প্রথম দিকে উপন্যাস এবং স্মৃতিচারণগুলো এই বিয়োগান্ত ঘটনার অন্যদিকগুলো প্রকাশ করতে থাকে। বস্তুত, সত্তর দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের উপরে লেখা দুটি উপন্যাস বিশিষ্ট পুরস্কার পেয়েছিল। রবার্ট স্টোনের 'ডগসোলজারস' আমেরিকার

সমাজে যুদ্ধের অভিঘাতটা দেখিয়েছিল। টম ও'ব্রিয়েনের বড়ো মাপের পরীক্ষামূলক উপন্যাস 'গোয়িং আফটার ক্যাসিয়াটো' দেখিয়েছে যেসব আমেরিকানরা এই যুদ্ধ শুরু করেছিল, তাদেরই উপরে এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। এইসব উপন্যাস এবং ফিলিপ ক্যাপুটোর 'এ রিউমার অফ্ দি ওয়ার' এবং মাইকেল হের-এর 'ডিসপ্যাচেস'-এর মতো ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ থেকে আমরা ভিয়েতনামের তিক্ত উত্তরাধিকার সম্বন্ধে নতুন করে বুঝতে পারি—যে বোঝাপড়া সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ রাজনৈতিক বিশ্লেষণকেও ছাড়িয়ে যায়।

সম্ভবত এটি 'ডিসপ্যাচেস'-এর মধ্যেই সবচেয়ে ভালভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ভিয়েতনামে 'এস্কোয়ার' এবং 'রোলিং স্টোন' পত্রিকার প্রতিবেদক ছিলেন মাইকেল হের। এঁর ব্যক্তিগত বিবরণ নতুন সাংবাদিকতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে উদ্দেশ্যমূলক প্রতিবেদনের বদলে এসেছে সচেতন বিষয়গত আঙ্গিক, সাংবাদিক একইসঙ্গে হয়ে উঠেছেন তাঁর বিবরণ দেওয়া ঘটনার সাক্ষী এবং অংশীদার। হের এইভাবে বলছেন ব্যাপারটা—

> কারো সঙ্গে একাত্ম হবার কথা বা নিজেদের কোনো ভূমিকায় আবদ্ধ করে ফেলা অথবা কোনো পরিহাসের কথায় বলতে গেলে—আমি যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়েছিলাম এবং যুদ্ধই আমাকে ছেয়ে ফেলল। শুনতে পুরোনো গল্প মনে হবে, অবশ্য যদি-না আপনারা এটা শুনে না থাকেন। আমি সেখানে গিয়েছিলাম এই স্থূল কিন্তু নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে যে সবই আমি দেখতে পাবো। নিশ্চিত এইজন্য যে আমি এই ভেবেই গিয়েছিলাম আর স্থূল এইজন্য যে আমি আসলে কিছুই জানতাম না। এই যুদ্ধই শেখালো যে তুমি যা করছ তার মতোই যা দেখছ তার জন্যও তুমি একইরকম দায়ী। সমস্যাটা হল যে তুমি কি দেখছ তা সবসময়ে জানতে পারছ না, যতক্ষণ না পরে, হয়তো অনেক বছর পরে বুঝবে যে এসবের অনেকটাই আদপে কিছু বোঝাতে পারেনি, কেবল তোমার চোখে থেকে গিয়েছে। সময় এবং খবর, রক অ্যাণ্ড রোল, জীবন, কিছুই স্থির নেই, কেবল তুমিই একজায়গায় আটকে গেছ।

ও'ব্রিয়েন এবং ক্যাপুটোর মতো, হের আমাদের মাটির সমতল থেকে ভিয়েতনামের যুদ্ধকে দেখতে শিখিয়েছেন, এবং সেদিক থেকে যুদ্ধটা দানবীয়, অদ্ভুত হলেও আগের চেয়ে সর্বব্যাপী হয়েছে। এটা দানবীয়, যখন কোনো সৈনিক তার বান্ধবীকে কোনো শত্রুর কাটা কান উপহার হিসেবে পাঠায় এবং এর পরে যখন

তার বান্ধবী তাদের সম্পর্ক ভেঙে দেয় তখন অবাক হয়ে পড়ে। এটা অদ্ভুত, যখন একজন মেজর স্মরণীয় শব্দসম্ভারে একটি শহরের ধ্বংসকে ব্যাখ্যা করেন—'বেল ট্রে-কে বাঁচাবার জন্যই আমরা একে ধ্বংস করতে বাধ্য হয়েছিলাম।' তথাপি শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধ একদিক থেকে সর্বব্যাপী হয়েছিল যা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন হতে পারেনি, কারণ হের এবং অন্যান্যরা আমাদের স'রে দাঁড়িয়ে বিচার করতে দেননি। এর মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে আমরা একে বিচার করতে পারি না এবং শক্তি হিংসা আর চরম অবস্থার অস্পষ্টতা সম্বন্ধে ভয়াবহ শিক্ষা না নিয়ে এতে জড়িয়ে পড়তেও পারি না। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, 'এ রিউমার অফ্ ওয়ার'-এ ক্যাপুটো যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর নিজের অনিশ্চিত ধারণার কথা বলেছেন। 'যিনিই ভিয়েতনামে লড়েছেন, যদি তিনি নিজের সম্পর্কে সৎ হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে লড়াইয়ের অনিবার্য আকর্ষণ তিনি উপভোগ করেছেন। উপভোগটা অদ্ভুত, কারণ এর সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে বেদনাও মিশে রয়েছে'—ক্যাপুটো এইভাবে লিখেছেন। 'অনেকটা ওষুধ খাইয়ে চেতনার বুদ্ধি ঘটানোর মতো। ঐ একইরকম আসক্তি এতে হতে পারে কারণ জীবনে এ ছাড়া আনন্দ বা দুঃখের যা কিছু ঘটে সবই ভোঁতা মনে হবে।'

তথাপি একথা ভাবলে ভুল হবে যে ও'ব্রীয়েন, হের বা ক্যাপুটো যুদ্ধের জয়গান করেছেন। তার বদলে এঁরা দেখাতে চেয়েছেন যে যারা প্রথম এই যুদ্ধের স্বাদ পেল, তারা বদলে গেল কেমন। ক্যাপুটো তাঁর ভিয়েতনামে ফিরে যাবার অযৌক্তিক বাসনার কথা বলেছেন, যদিও তিনি যুদ্ধের বিরোধী। কত গভীরভাবে আমরা বদলে গিয়েছি, ঐ বর্ষার দুঃখ, ক্লান্তিকর টহলদারী, উফাঞ্চলে লড়াইয়ের আশংকা যারা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়নি, তাদের থেকে আমরা কতটা আলাদা—এই উপলব্ধি থেকে ঐ আশ্চর্য বাধ্যবাধকতা এসেছে—

> ঐ সময়ে আমি যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলাম এবং ঘরে ফেরায় আকুলতার সঙ্গে যুদ্ধের বিরোধিতাকে মিলিয়ে নেবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছি। পরে বুঝেছিলাম যে এইভাবে মেলানো অসম্ভব। এই আন্দোলনে আমার বন্ধুদের মতো জমাট আবেগের সঙ্গে যুদ্ধকে ঘৃণা করতে আমি পারব না কখনোই। কারণ আমি এতে অংশ নিয়েছি, আমার কাছে এটা কোন ভাববাদী কল্পনা নয়; বরং একটা গভীর আবেগময় অভিজ্ঞতা, যেটা আমার কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আমার চিন্তা, ইন্দ্রিয় এবং অনুভূতিকে এই যুদ্ধ নিশ্ছিদ্র আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

পরিশেষে, সত্তরের দশকের ভিয়েতনাম সম্পর্কিত সাহিত্য যুদ্ধের যুক্তিহীন প্রকৃতিটা আমাদের বিশেষ করে বুঝিয়ে দিয়েছে। 'ডিসপ্যাচ'-এর শেষে যে সাংবাদিক বলেছিল 'তার যুদ্ধের সংবাদ পরিবেশনের জন্য যে জাগ্রত আবেগ তার চেয়ে তার রাত্রের দুঃস্বপ্নকে বড়ো বলে মনে হয় না', তার প্রতি আমরা সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ি। ইতিহাসকে এভাবে দুঃস্বপ্ন বলে অনুভব করাটা (যা থেকে তার অংশীদারেরা জেগে উঠতে চাইছে) নিশ্চয় আধুনিক সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু মাইকেল হের এবং টিম ও'ব্রীয়েন যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে এটা বিশেষভাবে ভিয়েতনামে আমেরিকান অভিজ্ঞতার সঠিক উপমা হয়ে উঠেছে। সমালোচক ফ্রেডরিক কার্ল সত্তরের দশকের ভিয়েতনাম সাহিত্যে এই পরাবাস্তব গুণটি ধরতে পেরেছিলেন—

ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস এবং যা উপন্যাস নয় (উদাহরণ স্বরূপ, 'এ রিউমার অফ্ ওয়ার' এবং 'ডিসপ্যাচেস') একদিক থেকে এরা ইতিহাস থেকে চ্যুত, স্থান এবং কালের বাইরে ব্যাপ্ত। যেসব লেখকরা যুদ্ধের কথা লিখেছেন, এখানে ও'ব্রীয়েন, রবার্ট স্টোন, মাইকেল হের, ফিলিপ ক্যাপুটো—প্রত্যেকে এমন সৃষ্টি করেছেন যেখানে অতীত এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ নেই। এইভাবে এঁরা যুদ্ধকে আরো দুঃস্বপ্নময় করে তুলেছেন অর্থাৎ স্থান কালের পরিচিত জগৎ থেকে এমনভাবে সরে গেছে যে এটি একটি কাল্পনিক জীবন হয়ে ঝুলে থাকছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উপন্যাস থেকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের উপন্যাসের পার্থক্য হ'ল এর প্রাণহীনতা—দেশের বা যুদ্ধক্ষেত্রের কোন কিছুর সঙ্গেই এ যুক্ত নয়। এর চরিত্রগুলো একটি পরাবাস্তব অঞ্চলে যুদ্ধে লিপ্ত হয়—জঙ্গল, আকাশ, মাটি, ঘূর্ণায়মান হেলিকপ্টার, একটা ভূতুড়ে ধরনের শত্রুদল, বন্ধু আর শত্রুর তফাৎ বোধগম্য না হওয়া।

এই আপাতচ্যুতির একটা কারণ এই হতে পারে যে এই লেখকেরা ভিয়েতনামে সৈনিক বা সাংবাদিক হিসেবে তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। ফলে তাদের কাজগুলো হয়েছে অভিজ্ঞতার উপরে কল্পনার রং চড়ানো বর্ণনা—এদের মধ্যে একটাই মিল আছে, সেটা হ'ল সাধারণ জীবন থেকে ভিয়েতনামের যুদ্ধটা আলাদা হয়ে গেছে। পরবর্তী সময়ে এই ধরনের আত্মজীবনীমূলক ভিয়েতনামী সাহিত্য বন্যার মতো এসেছিল, প্রায় দুশো বই এ-বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠীর লেখকদের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে, যাঁরা অন্য পরিপ্রেক্ষিত থেকে যুদ্ধটা দেখলেন এবং যুদ্ধকে এনে ফেললেন ঘরের আঙিনায়।

যদি ভিয়েতনামী সাহিত্য সত্তর দশকে আমেরিকার সংস্কৃতির উপরে একটি প্রধান অভিঘাত হয়ে থাকে তাহলে মহিলাদের উপন্যাস হয়েছিল আরেকটি অভিঘাত। কিন্তু এইসব উপন্যাসের বেশির ভাগই ছিল গার্হস্থ্য জীবন এবং ব্যক্তিগত সমস্যাকেন্দ্রিক। স্যালি এমার্সন, ফ্রান্সেস ফিট্‌জেরাল্ড এবং মেরি ম্যাকার্থীর মতো কয়েকজন সাংবাদিক বিশেষ উপলব্ধির সঙ্গে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিষয়ে লিখেছেন, কিন্তু কোনো মহিলাই সাহস করে এই যুদ্ধকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেননি। কিন্তু ১৯৮৪ সালের পর থেকে তিনটি উপন্যাস বেরিয়েছে, যেগুলো বিভিন্নভাবে নতুন নতুন পরিপ্রেক্ষিত থেকে ভিয়েতনাম অভিজ্ঞতার উপরে কল্পনাপ্রবণ পুর্ণ দৃষ্টিপাত করেছে। সেগুলো হ'ল ; ববি এ্যান ম্যাসনের 'ইন কান্ট্রি', জেন এ্যান ফিলিপসের 'মেসিন ড্রীমস' আর জোয়ান দিদিয়োঁ'র 'ডেমোক্রেমি'।

যদিও 'ইন কান্ট্রি'র নামকরণ ভিয়েতনামে বসবাসের ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু ববি এ্যান ম্যাসনের উপন্যাসের পটভূমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। কেনটাকির হোপওয়েল (নামটা কাকতালীয় নয়) মধ্য আমেরিকার একটি ছোট শহর যেটি যুদ্ধের প্রতিঘাত থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে। নায়িকা হল স্যাম হিউজেস নামে একটি স্বাধীন কিশোরী যার জন্মের আগেই তার বাবা ভিয়েতনামে নিহত হয়েছে। তার মা আবার বিয়ে করেছে এবং অতীতকে ভোলার চেষ্টায় অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। তার কাকা একজন প্রাচীন ভিয়েতনামী, এজেন্ট অরেঞ্জ নামে এক রসায়ন দ্রব্যের প্রভাবে মনে হয় বর্তমান পারিপার্শ্বিক থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে গেছে। গল্পটা ঐ কিশোরীর প্রাপ্তবয়স্ক জগতে প্রবেশের ব্যাপার নিয়ে লেখা যেখানে সকলেই মেয়েটিকে রক্ষা করতে চাইছে। বিষয়টা একটা কাল্পনিক ভ্রমণের রূপ নেয়—তার বাবার চিঠি এবং লেখার মধ্য দিয়ে সে বাবার ভিয়েতনামী অভিজ্ঞতাকে পুনর্গঠন করতে চায়—অক্ষরে অক্ষরে এবং ধ্যান-ধারণায় সে ঐ জগতটা আরেকবার গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। স্যামের অতীতকে আবিষ্কার করার চেষ্টাটা তার ব্যক্তিগত সবাকে ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করার অর্ধচেতন চেষ্টাও বলা চলে—যা থেকে সবাই তাকে রক্ষা করতে চেয়েছে। উপসংহারের মর্মস্পর্শী দৃশ্যে দেখা যাবে সে ওয়াশিংটনের ভিয়েতনাম স্মৃতিসৌধে বাবার নাম দেখতে এসে নিজের অতীতকে আবিষ্কার করল।

জেন এ্যান ফিলিপ্‌সের 'মেসিন ড্রীমস'ও মধ্য আমেরিকার ভিয়েতনামের অভিঘাত বর্ণনা করেছে। এ্যান বেছে নিয়েছে একই পরিবারের দুই প্রজন্ম। পুরোনো প্রজন্মটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বড়ো হয়ে উঠেছে যখন ভালমন্দ তফাৎ

করা সহজ ছিল। নতুন প্রজন্মটি ষাটের দশকে বড়ো হচ্ছে যখন বিষয়টি এত পরিষ্কার নয়। ছেলে যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধে নাম লেখায় তখন সে বুঝতে পারে যে, ঐতিহ্যের মূল্য তার অভিজ্ঞতার বিশালতার তুলনায় যথেষ্ট নয়। যুদ্ধের আগুনে শেষ হয়ে যাবার ঠিক আগে সে বোনকে লিখছে 'যুদ্ধটা ঠিক কি ভুল এ নিয়ে ভাববার বেশি সময় নেই—ঠিক যে কি তা বেরিয়ে আসছেই। আমি লুক আর তার দলের সঙ্গে একটা খাঁড়ার নীচে রয়েছি। এই একটা দেশই আমি জানি যেটা আমি রক্ষা করতে চেষ্টা করেছি—আমি এমন বুদ্ধু নই যে ভাববো এটা আমারই দেশ।' বিলি তার বোন ডেনারকে এই একটি অনুভূতিই দিয়ে গেছে। 'ইন্ কান্ট্রি'র স্যাম হিউজেসের মতো, যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া তার ভাইকে ফিরে পাবার মধ্য দিয়েই সে তার অতীতকে খুঁজেছে। ডেনার উপন্যাসের শেষে বলেছে, 'বিলি যেভাবে জানতো,—যে সব খবর ওর কাছে ছিল, ওর শিক্ষানবিশি, ফোর্ট নক্সে যাবার আগে ও যা জানতো—বলতে গেলে পৃথিবী সম্বন্ধে ও যা জেনেছিল, আমি সেইভাবেই অতীতকে জানি।'

'ইন্ কান্ট্রি' এবং 'মেসিন ড্রীমস' দুটো উপন্যাসেই ইতিহাসের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টায় ভিয়েতনাম অভিজ্ঞতাকে নতুন করে গড়ে নেওয়া হয়েছে। তার মানে দুটো উপন্যাসই স্মৃতিমূলক। জোয়ান দিদিয়োঁর 'ডেমোক্রেসিও' স্মৃতিচারণমূলক। যখন নায়িকাকে (কেনেডি ধরনের এক সিনেটরের বউ) জিজ্ঞাসা করা হয় যে প্রকাশ্য জীবনের জন্য বড়ো দাম কি দিতে হয়, সে জবাব দেয়, 'প্রধানত স্মৃতি।' এতে সে কেবল ব্যক্তিগত অতীতের অপচয়ের কথাই বলছে এমন নয়, বরং ব্যক্তিগত সত্তা যাতে গড়ে ওঠে সেইরকম নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষতির কথাও বলছে। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সবরকম সচেতনতা নিয়ে দিদিয়োঁর উপন্যাস দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর আমেরিকার ব্যক্তিগত এবং প্রকাশ্য জীবনযাপনে মূল্যবোধের ধ্বংস নিয়ে বড়ো ধরণের আলোচনা করতে চেয়েছে। উপাখ্যানটা যে ১৯৭৫ সালে সাইগণের পতনের সঙ্গেই শেষ হয়েছে, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

দিদিয়োঁ অবশ্য সেই এক 'ডেমোক্রেসি' নামটাই বেছেছেন, যেটি ঊনবিংশ শতকের আমেরিকান ঐতিহাসিক হেনরি এ্যাডাম্স আমেরিকার গিল্‌টি করা রাজনৈতিক জীবনের দুর্নীতি নিয়ে ব্যঙ্গ করার সময়ে বেছে নিয়েছিলেন। এ্যাডাম্সের মতই দিদিয়োঁ ওয়াশিংটনকে এমন এক উত্তাপের অনুপাত হিসেবে দেখেছিলেন যেখানে নৈতিকতা এবং রাজনীতির অন্তরঙ্গ যোগ ভেঙে পড়েছে। এ্যাডাম্সের মতো, দিদিয়োঁ ব্যক্তিগত এবং প্রকাশ্য ইতিহাসের সম্পর্কে নিয়ে ভেবেছেন।

যেমন ম্যাসন এবং ফিলিপ্‌স ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন মধ্য আমেরিকাকে দেখিয়েছেন, দিদিয়োঁ তেমনি আমেরিকান নির্দোষ ধারণার একটি ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকেছেন, যে এখনো বিশ্বাস করে যে সে ইতিহাসের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে পারে। নায়িকা ইনেজ ভিক্টরকে এই কঠোর সত্যটা জানতে হয়েছে—

> আমি এখন বুঝতে পারছি যে কুয়ালালামপুরে ইনেজ ভিক্টরকে আমি যে অপার্থিব শান্তির মধ্যে দেখেছি তার জন্ম হয়েছিল আটমাস আগে···যখন সে জানতে পেরেছিল যে তার পাশপোর্ট তার 'দূরদৃষ্টির জন্য (যার কথা সে আমায় বলেছিল) রেহাই দেয়নি। 'দূরদৃষ্টি' বলতে আমার বিশ্বাস সে ইতিহাসকে বুঝিয়েছিল, অথবা আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে, পাওয়া এবং না পাওয়ার ফিরে ফিরে আসা স্রোতের কথা, কোন ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টার প্রভাবহীন পৃথিবীর আক্ষেপের কথা, যেটা ইনেজ তার অভিজ্ঞতায় অস্বীকার করতে চেয়েছিল। সে তার ছেলেবেলা এই বিশ্বাসে কাটিয়েছিল যে আমেরিকার উপনিবেশের আরামদায়ক, দুর্নীতিহীন জীবন (হাওয়াই) একটা শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশের উপরে ব্যক্তিগত জয়ের পরাকাষ্ঠা। তার প্রাপ্তবয়স্ক জীবন সে তার স্বামী হ্যারী ভিক্টরের বিশ্বাসকে মেনে নিয়ে কাটিয়েছে যে ভিক্টর প্রেসিডেন্ট হতে পারবে।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই নতুন ধরনের ভিয়েতনামী সাহিত্যে দুটি বড়ো বিষয় একসঙ্গে এসেছে—নায়িকার নারী হিসেবে এবং আমেরিকান হিসেবে বড়ো হয়ে ওঠা। ইনেজ্ ভিক্টর যখন তার রাজনৈতিক স্বামীকে পরিত্যাগ করে নিজের জীবন গড়ে তুলল তখন সে হ'ল এক স্বাধীন রমণী। আবার সে যখন ইতিহাস থেকে 'আমেরিকান ছাড় দাবী না করে' কুয়ালালামপুরের বাস্তহারাদের মধ্যে কাজ করতে গেল, তখন সে হ'ল একজন প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান। যখন সে স্বামীকে ছেড়ে এল তখন সে শুধু নিজের নির্জীব ঘরের জীবন ত্যাগ করল তাই নয়, বরং তার আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীও শেষ হয়ে গেল। 'সে ছিল একজন সংবেদনহীন পুরুষ (দিদিয়োঁ লিখছেন), কিন্তু যারা ওয়াশিংটনে থেকেছে, তাদের মতোই তার ছিল স্থূল আত্মবিশ্বাস, অনিবারণীয় স্বজাতিগর্ব।' মানুষকে, এমনকি নিজেকেও, কূটনীতির সত্তাহীন, আত্মিক প্রসারণ হিসেবে পরিণত করার জন্য হ্যারি ভিক্টরের চেষ্টাকে দিদিয়োঁ বিশেষ করে আমেরিকার রাজনীতির অসুখ বলেই নির্ণয় করেছেন।

একটি শেষ কথা বলার আছে। ভিয়েতনাম বিষয়ক সাম্প্রতিক বই বা চলচ্চিত্র

কেবলমাত্র ব্যবচ্ছেদের অংশ নয়। এগুলো শেষ পর্যন্ত আমেরিকার অতীত সম্বন্ধে ততটা নয়, যতটা আমেরিকার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। যাতে অবধারিত-ভাবে ভিয়েতনামের সঙ্গে মধ্য আমেরিকার যোগাযোগ দেখানো হয়, এমন রাজনৈতিক বিতর্কেই কেবল এটা দেখতে পাই এমন নয়, সাংস্কৃতিক আলোচনাতেও এই একই প্রসঙ্গ ওঠে। অলিভার স্টোনের বিখ্যাত ভিয়েতনামী ছবি 'প্লাটুন'-এর ঠিক আগের ছবিটার নাম যে 'সালভাদর' এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। জোয়ান দিদিয়োঁর 'ডেমোক্রেসি'র ঠিক আগের বইটার নামও যে 'সালভাদর', এটাও সংঘটনের হঠাৎ মিল, এমন নয়। ঠিক যেমন জোয়ান দিদিয়োঁ এবং অলিভার স্টোন ভিয়েতনাম এবং এল সালভাদরকে এক করে দেখাটা স্বাভাবিক বলেই ভেবেছেন, সেই রকমই অন্যান্য সাম্প্রতিক উপন্যাসেও ভিয়েতনাম পর্বের পরের যুগের আমেরিকার জাতীয় চরিত্র বর্ণনার জন্য মধ্য আমেরিকাকেই পটভূমি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, রবার্ট স্টোন তাঁর বিপ্লবী এবং প্রতিবিপ্লবী রাজনীতি নিয়ে লেখা 'এ ফ্ল্যাগ ফর সানরাইজ' উপন্যাসে ভিয়েতনাম এবং মধ্য আমেরিকার মধ্যে সমান্তরাল রেখাঙ্কনের উপরে বিশেষ জোর দিয়েছেন। যদিও উপন্যাসটির ঘটনা ঘটছে কাল্পনিক 'টেকান' (সোমোজার প্রয়াণের আগেকার নিকারাগুয়ার সঙ্গে এর মিল আছে) দেশে, 'নাম' (Nam)-এর ছায়া পড়েছে সর্বাঙ্গে—ফ্রেডেরিক কার্ল এটা লক্ষ করেছিলেন, 'স্মৃতিতে, চিত্রকল্পে, আদর্শগত ঋজুতায়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগত দোদুল্যমানতায়। ভৌগোলিক অবস্থান যাই হোক না কেন, ভিয়েতনাম হয়ে দাঁড়াল জীবনের উপমা।' অনুরূপভাবে, 'দি মসকুইটো কোস্ট'-এ পল থোরো দেখিয়েছেন একটি সাধারণ আমেরিকান পরিবার কি বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল যখন এক অসাধারণ পিতা সমসাময়িক আমেরিকান সমাজের অবক্ষয় থেকে মধ্য আমেরিকার জঙ্গলের বিশুদ্ধতায় পরিবারটিকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। থোরোর নায়ক ধ্রুপদী আমেরিকান ছাঁচে গড়া, একজন বিশুদ্ধ আদর্শগত এবং স্বতন্ত্র ধরনের আবিষ্কারক যিনি একইসঙ্গে প্রতিভাবান এবং পাগলাটে। কিন্তু তাঁর কল্পনাপ্রবণ আদর্শ একটি ধ্বংসকারী বাতিক হয়ে দাঁড়াল যখন তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের সমৃদ্ধির জন্য জঙ্গলের মধ্যে বরফ-কল বানাতে চাইলেন। এ্যালি ফক্স একটি চমৎকার চরিত্র, পরবর্তীকালের থোরো এবং ক্যাপ্টেন আহাবের সংমিশ্রণ, কিন্তু ভিয়েতনামোত্তর প্রসঙ্গে আমাদের অন্য আমেরিকান স্বপ্নদর্শীদের কথা মনে করিয়ে দেয় যাঁরা ভিয়েতনামে নিজেদের পরিকল্পনার মধ্যে তাঁদের স্বপ্নের কাজে ডুবে গিয়েছিলেন।

শেষ যে উপন্যাসটির কথা আমি বললে চাই, সেটিতেও ভিয়েতনাম পর্বের পরেকার আমেরিকার সঙ্গে দক্ষিণদেশের প্রতিবেশীদের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এটি রবার্ট স্টোন বা পল থোরোর কাজের থেকে আলাদা। রাসেল ব্যাঙ্কসের 'কনটিনেন্টাল ড্রিফট' আঙ্গিকের দিক থেকে না হলেও, বিষয়গতভাবে ব্যক্তিগত এবং প্রকাশ্য জীবনের সম্পর্কের ব্যাখ্যায়, অর্থাৎ ইতিহাসে আমাদের জড়িত হওয়ার ব্যাপারটার বিষয়ে—জোয়ান দিদিয়োঁর 'ডেমোক্রেসি'র কাছাকাছি গিয়েছে। দিদিয়োঁর মতোই ব্যাঙ্কস দেখাতে চেয়েছেন যে গণ-আন্দোলন এবং গণ-অভিপ্রয়াণ প্রভাবিত সমসাময়িক পৃথিবীতে আমরা কেমনভাবে যুক্ত আছি। বাস্তবিক-পক্ষে, পশ্চিম গোলার্ধে এইরকম দুই অভিপ্রয়াণের অনিবার্য সম্পর্ককেই ব্যাঙ্কস্ প্রকাশ করতে চেয়েছেন—উত্তমহীন উত্তরপূর্ব থেকে গ্রীষ্মাঞ্চলে আমেরিকার শ্রমিকদের দক্ষিণায়ণ এবং মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তহারাদের ঐ একই আশাপ্রদ অঞ্চলের জন্য উত্তরায়ণ। ব্যাঙ্কস দুটো পৃথক ঘটনা নিয়ে শুরু করেছেন, একজন শ্বেতকায় আমেরিকান ঐশ্বর্য খুঁজছে এবং একজন কৃষ্ণকায় হাইতি রমণী চাইছে স্বাধীনতা—যাদের জীবন খেদজনক ভাবে জড়িয়ে গেছে। পৃথক পৃথক ঘটনার মধ্যে যে সংযুক্তি আছে, রাসেলের সেইটা দেখানোর ক্ষমতাই শুধু নয়, বরং আমাদের পৃথক পৃথক কাজের ফলে যে অনিচ্ছাকৃত বিপর্যয় ঘটে সেইটা অনুভব করানোই হ'ল 'কনটিনেন্টাল ড্রিফট'-এর উল্লেখযোগ্য দিক। ববি এ্যান ম্যাসন এবং জেন এ্যান ফিলিপ্‌সের মতো, উনি দেখিয়েছেন কেমন করে আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ—যাকে দিদিয়োঁ বলেছেন আমেরিকান রেহাই—তার মুখোশ খুলে যায়। এই মুখোশ খোলাটা অবশ্য কর্তাবিরোধী কাজ, লেখকরা সেটা জানেন। সম্ভবত রাসেল ব্যাঙ্কস তাঁর উপন্যাসের সমাপ্তি অংশে একেবারে জলের মতো এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন—

> পৃথিবীটা নিজের মতোই চলছে। বই লেখা হচ্ছে—উপন্যাস, গল্প, কবিতা বেরোচ্ছে—যাতে এমন সব জিনিষ থাকে যাতে পৃথিবীটা কেমন এটা আমাদের বলার চেষ্টা করা হয়—যেন মানুষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা (উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মতো) মানুষকে মুক্তি দেবে। তা দেবে না। নায়কের জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে জানতে পারলে পৃথিবীর কিছুই বদলায় না। তার জীবনে আমাদের উৎসাহ এবং তাঁর মৃত্যুতে শোক হলে অবশ্য তা' ঘটতে পারে। আমাদের নিজেদের ছাড়া অন্য জীবনের—এমনকি পুরোপুরি বানানো জীবনের আনন্দ এবং বিমর্ষতা,—নিজের মতো থাকার জন্য যে লোভ থাকা

উচিত, তা' থেকে পৃথিবীকে বঞ্চিত করে। অন্তর্ঘাত এবং কর্তৃত্ব বিরোধ—এই দুটোই হ'ল তাহলে এই বইয়ের উদ্দেশ্য। তবে যাও, হে আমার গ্রন্থ—যেমন আছে পৃথিবী তাকে ধ্বংস করতে সাহায্য কর।

ভাষান্তর : পিনাকী ভাদুড়ী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচটি কবিতা

অভী সেনগুপ্ত

একজন কবিতাপ্রেমী কিংবা সুখদুঃখের সাদায়-কালোয় মাখামাখি মানুষের জন্য কবিতা আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নামে আজ সমার্থক হয়ে উঠেছে। যেমন একই সঙ্গে আমাদের পঠনযোগ্যতা তার নির্বাচনের হাতিয়ারটি দিয়ে একরকম ছেঁকেই তুলে আনছে এই ভাষার কবিতার আরও কিছু প্রিয় নাম। সুদীর্ঘ যাত্রা পথের রূপ-রস-বর্ণ-মায়া অবলীলায় বিলিয়ে দিতে দিতে শক্তির কবিতার উন্মোচন প্রতি মুহূর্তে দিক্‌বদল ক'রে চলেছে—মহৎ কবিতার লক্ষণাক্রান্ত এমন সব প্রাপ্তি-যোগ আমাদের অজস্রবার শিহরিত ক'রে দেয়। এই সব কারণেই বাংলা কবিতার পাঠক, তার স্মৃতির জালটি এই সমুদ্রসদৃশ কবির যত্রতত্র ছুঁড়লেই বিবিধ রতন পেয়ে যান।

বনানীর কাছে আলোছায়ার মতন শক্তি কবিতার বাড়ানো দু'হাতের মধ্যে ধরা পড়েছেন, নিজেকে ধরা পড়তে দিয়েছেন নিত্যনতুন আগ্রহে, আশ্লেষে। রসিক-ভাবুক যেমন তার নারীর স্তর থেকে স্তরে নিজের বয়স আর নিজস্ব কতকিছুকে একজীবন অবগাহন করায়। 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' দিয়ে যার যাত্রা শুরু তিনি কি বুঝেছিলেন তার হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া নীলিমানির্দিষ্ট তীরগুলির কথা?—সেইসব তীরগুলিকে আর তূণে ফেরার ডাক দেওয়া যায়নি। শক্তির যোগ্যতার সমর্থনে পথিমধ্যে উঁচু ডালটি ছোঁয়ার জন্য হঠাৎ-ই লাফ দেবার মতন কারণহীনতার আনন্দে বলতে ইচ্ছা করে—এই কবি তার ছেড়ে আসা কবিতাগুলিকে যেন সারি-সারি কিউরিওর মর্য্যাদা দিয়েছেন, কখনও পুনরাবৃত্তির মোহে নিজের কবিতাকে পথে বসাননি। অথচ আমার সঙ্গে তুল্য কবিতার পাঠকেরা 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য,' 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো', 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান'—প্রভৃতি পর্বের কাছে শক্তিকে শাশ্বত থাকার জন্য ভুল আবেগে কত না তোলপাড় হয়েছেন একান্তে, কোলাহলে।

বর্ণময় পঞ্চাশ দশকের মধ্যে বসন্তের পলাশ কিংবা গ্রীষ্মের কৃষ্ণচূড়ার মতন শক্তির কবিতা। আগুন আছে দাহ্যতা নেই সেই রূপ যা চোখকে বারংবার কাছে

টানে। অথচ এক উচ্ছ্বাসিত হাহাকার কিংবা রূপসীর খেয়ালে পাঠকের স্মৃতির সঙ্গে উপমিত কাকচক্ষু জলে তার কবিতাগুলি যখন তখন শরীরে ডুবিয়ে দেয়। তখন অবধারিত চরাচরে উপস্থিত ওলোটপালোট হাওয়া, আকাশের নীল জুড়ে ছোটবড় সাদা মেঘেদের দৌড়ঝাঁপ আর বাকি প্রকৃতির দুই ঠোঁটে মন্ত্রের মতন ক'রে উচ্চারিত জীবনের সুরেলা নামগান। ভালবাসার মোচড়গুলি এইভাবে আরও একবার নিজস্ব নিয়মে পরিচিত হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে।

শক্তির কবিতার ইতিহাস—ঝরনার থেকে নদী হয়ে ওঠার পরিনতির কাহিনী। যে-কবি এক উপকারী দস্যুর ভূমিকায় ছন্দের নানান অনুশাসনকে নতুন সংজ্ঞার দিকে মুখ ফেরাতে চেষ্টা করেছেন, সেই নয়নভোলানো নৃত্যপরতা হতে পারে আজ যথেষ্ট সুস্থিত, খরস্রোতহীন। কিন্তু মনে রাখতে হবে এক স্থির প্রবাহমান-তার কথা, যার আর এক নাম নদীও। যার সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে অগ্রসর শক্তির এখনকার কবিতা যেখানে অজস্র শহর আর গ্রামগঞ্জ আর কলকারখানাগুলি তাদের পরিত্যক্ত বস্তুদের প্রায় গায়ে প'ড়ে এসে ঢেলে দিয়ে নদীটিকে ভার বইতে বাধ্য করায়। একজন ছিলাটানকরা, বয়স আর উপলব্ধিমনস্ক কবির এই-সবই নিয়তি। এই কারণেই কেউ যদি মনে করেন—শক্তি এখন ফুরিয়ে আসছেন বা ফুরিয়ে গেছেন, তবে আমার আপত্তি তাকে স্পর্শ করবে। কেননা তখন 'ফুরনো' শব্দটিকে আমার অন্যায় থেকেও কয়েকধাপ নিচুর শব্দ বলে মনে হতে পারে। পরিণত কবিকে একজীবন নানানভাবে সইতে হয়। ফলে জীবনের প্রতিফলিত ছিরিছাঁদগুলি তার কবিতায় নতুনভাবে আবিষ্কৃত হয়। আবার তার কবিতা কখনও বা সাদামাটা ভাবে গড়াতে গড়াতে একসময় নিজস্ব বহনক্ষমতা নিয়ে ঠিকই উঠে দাঁড়ায়। শক্তির বর্তমান সময়ের কবিতা সম্পর্কে পাঠক, আমার সদ্যসমাপ্ত বাক্যটির যে-কোনও অর্ধের সঙ্গে আপনার মতবাদকে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

'এতো কবি কেন?'—এই শিরোনামে একটি ভারাক্রান্ত গদ্য লিখে এই মুহূর্তে বিতর্কিত শক্তি 'এতো কবিতা কেন?'—পাঠকের এই প্রশ্নের মুখোমুখি নিজেকেও দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পারেন। 'এতো কবি কেন?' ধরনের নানান অসহিষ্ণুতা ও এলেবেলে ব্যবহার ক'রেও কবিতার ছদ্মবেশে শক্তির অলৌকিকতা পাঠকের পাওনাগণ্ডাকে উজ্জ্বল ক'রে চলেছে। আবার একইভাবে শক্তির করতল ছাপিয়ে-ওঠা কবিতাগুলি তার সম্পর্কে পাঠকের ধারণার প্রদীপশিখাটিকে নিষ্কম্প রাখছে।

শক্তির কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা ওয়াচপয়েন্ট থেকে জঙ্গল

দেখার মতন সাবলীল রহস্যের কণামাত্র তুলে আনার কথা মনে পড়ায়। সেই জঙ্গল যেখানে শতাব্দী কিংবা তুলনীয় সময় বাঁধা প'ড়ে রয়েছে। হিংস্রতার খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য সুন্দর যেখানে কান উঁচু ক'রে ঘুরে বেড়ায়, গাছের সঙ্গে গাছের ঘেঁষাঘেঁষি-স্পৃহা যাবতীয় যান্ত্রিকতার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকে। আর কী এক দুর্নিবার আকর্ষণ সেই রহস্যময়তাকে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধির স্তরে পৌঁছে দেবার জন্য বুকের গভীরে কড়া নাড়তে থাকে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই সব অর্থে আদিমতার মতন একাকী আর নানান রহস্য-জানা এক মুখর তাপস।

আমার এই আলোচনাটি যে সূত্র ধ'রে কিছুটা আয়ু পেলেও পেতে পারে তা হচ্ছে—'বিভাব'-এর এই সংখ্যায় প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচটি কবিতা। প্রথম কবিতা 'অগ্নি যতো, ততো প্রাণ' থেকেই শক্তি ব্যাপ্তির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের একটি কপিবুক দৃষ্টান্ত এই কবিতায় পাঠকের জন্য কিছু আচ্ছন্নতা অপেক্ষায় রয়েছে কেননা 'অনন্যোপায় দিঙ্‌নাগ'-এর মতন শব্দের দুর্লভ যোগসাজসের পরই তিনি বশীকরণের ক্ষমতায় আবার লেখেন 'মেঘের কুণ্ডলী তাতে সসাগরা ধরিত্রী মেশানো'। আট লাইনের একটি কবিতা এই অর্থে আমাদের বিস্ময়স্পৃষ্ট করে। দ্বিতীয় কবিতা 'এই কুষ্ঠরোগীপ্রাণ' এসেছে চতুর্দশপদীর মেজাজ নিয়ে, আঁকাড়া শব্দের প্রতি তার সুস্থ কামনাবাসনার উদাহরণ 'কুঠো' শব্দটির ব্যবহার। শব্দসাজানোর লীলাখেলায় 'দু'হাতের সবেষ্টনী' একটি পঙ্‌ক্তির পরই হয়ে ওঠে 'দু'হাতের সুবেষ্টনী'। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মোহস্তব্ধ হয়ে গেছি 'বাঘের নখের মতো মাঘের হিমানী'—এমন চিত্রকল্পের আমদানীতে। 'খেলাচ্ছলে' কবিতাটিতে শক্তি ছড়ার ছন্দের মাঠেঘাটে একশরীর স্বাস্থ্য নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। 'শুধিয়ে' শব্দটিকে মাত্রামুক্তির প্রবণতা দেবার আগে 'বেড়িয়ে বেড়ায়'-তে তিনি পাকদণ্ডী বেয়ে যেন তারুণ্যের সাহস আর যোগ্যতায় চারমাত্রায় পৌঁছে গেছেন। চতুর্থ ও পঞ্চম কবিতায় শক্তি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পুনরাগমন করেছেন। 'ঘরের মধ্যে আছে'-তে রয়েছে ফুলের সমারোহ থেকে অন্য কিছুর চিত্রকলাগুলি, যেখানে একটি তুলকালাম উদাহরণ হচ্ছে 'ভূতের ভয়ের মধ্যে ওরা সব তন্দ্রার প্রহরী'। কবিতাটির দশম পঙ্‌ক্তিতে এসে একই সঙ্গে থমকে এবং চমকে যেতে হয় 'সম্বৎসর' শব্দটির চারমাত্রায় ব্যবহারযোগ্যতার কাছে। ঐ চারমাত্রা এখানে কীভাবে বিভক্ত হয়েছে? সে কি ১+৩ নাকি ২+২ নাকি অন্যকিছু? আমি অন্তত ধন্দে ছিলাম কিছুক্ষণ। একালে সম্ভবত সবচেয়ে বেশী এলিজি লিখেও সমান টানটান কবি পঞ্চম ও শেষ কবিতা 'উৎসবে'-তে

কিছু ব্যক্তিগত অনুভব আর প্রসঙ্গের জন্য মায়াময় যাত্রাপথ বিছিয়ে দিয়েছেন। কবিতাটির কাছে কিছু সময় একাগ্রতা নিয়ে ব'সে থাকতে হয়, সেই একাগ্রতা যা আমার সময় আমার জন্য একমাত্র কিছু প্রিয়শিল্প ছাড়া অন্য কোথাও রাখবারযোগ্য নয়।

একই সঙ্গে ট্রাডিশনাল আর তছনছকারী কবি এক অন্তর্বিহীন পথ পেরিয়ে যাবার জন্য তার নিষ্পলক ক্ষমতা একইরকম ভাবে দেখিয়ে চলেছেন, আর তার কাব্যজিজ্ঞাসার প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে আলোচিত হচ্ছেন। এই বিশিষ্টতা তার জন্য বাংলা কবিতায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। 'আবিষ্কারক' শব্দটির জন্য এই মুহূর্তের কবিতার থেকে উদাহরণ বাছাই করতে হলেও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম একলহমায় প্রথমদিকে উচ্চারণ করতে হবে। পঞ্চাশ থেকে আশি—এই চার দশকের ইতিহাস অন্তত এই এক জায়গায় থমকে আছে।

অগ্নি যতো, ততো প্রাণ

অগ্নি মতো, ততো প্রাণ, ছিলো তো নির্বেদে,
অশ্রু যতো, ততো ক্লেদ, ছিলো এ-সংসারে,
তবু কেন তৃপ্তি নেই, তৃপ্তির বাহিরে—
অন্য কিছু আছে, তাতে পরিত্রাণ নেই।

বিশিষ্টতা ছিলো, ছিলো অনন্যোপায় দিঙ্‌নাগ
মেঘের কুণ্ডলী, তাতে সসাগরা ধরিত্রী মেশানো
কষ্টকল্প, কায়কল্প ভ্রূভঙ্গে শোণিত,
অগ্নি যতো, ততো প্রাণ, ছিলো তো নির্বেদে!

এই কুষ্ঠরোগী প্রাণ

এই কুষ্ঠরোগীপ্রাণ, এই ভালোবাসা
প্রকৃত কুঠোকে কি গো ভালোবাসা যায়—

কোন্ প্রয়োজনে লাগে? প্রকৃত দুহাত
যে বের করেনি, তাকে, কুঠো বলা যায়?
দুহাতের সন্বেষ্টনী আমাকে ভাবায়
বলে, ভালো আছি কিনা, পরাঙ্মুখ কিনা
দুহাতের স্ববেষ্টনী আমায় করেছে—
নিতান্ত সম্পর্কহীন, ভালোবাসাহীনও।
এপারে-ওপারে আছে আপনতা ঠিকই
অসংখ্য মৌচাকে সে কি ঢিল মেরে যেতো
এপারে-ওপারে আছে আপনতা ঠিকই
বাঘের নখের মতো মাঘের হিমানী—
এই কুষ্ঠরোগীপ্রাণ, এই ভালোবাসা
প্রকৃত কুঠোকে কি গো ভালোবাসা যায়?

খেলাচ্ছলে

খেলাচ্ছলে বেড়িয়ে বেড়ায় নাম জানো তার?
সে তো এমন মানুষ ছিলো শুধু যাবার,
বিষয়ট আচ্ছন্ন করে আছেও বা সে
হয়তো কিছু পণ করেছে মিষ্টি হেসে—
শুধিয়ে, সব হিসেব, রইলো কানাকড়ি
মানুষটার তো কাছেই ছিলো দড়াদড়ি!

২

প্রতিদিনের খবরকাগজ সঙ্গে রাখে
মানুষ ছিলো চিরস্বাধীন, গোলাপবাগে—
দেখেছিলো একটি কাঁটা মনোহরণ,
তার কথা কেউ বলেনি, তাই দেখেছিলো।
অবাক-করা বারো মাসের তেরো পাবন
একটু উঁচু, আধেক নিচু হতেই হবে।
এড়িয়ে যাও, এড়িয়ে যাও, প্রাণ ফুরোবে—
হয়তো উঁচু, হয়তো নিচু হতেই হবে।

ঘরের মধ্যে আছে

ফুলের জঞ্জাল আমি মাড়াই দুপায়ে
উঠোনের এ-অবস্থা। কাঠচাঁপা ঝরে পড়ে আছে।
ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে আমি যতো যেতে চাই
ততো যাই কাঠচাঁপায় জড়িয়ে।

এছাড়া আমার আছে যুঁইফুল, বেলি ও মাধবী
তাদের একজন শুধু গাছে সেঁটে থাকে।
বাকি সব ঝরে পড়ে পদতল স্পর্শ করবে ব'লে
ভূতের ভয়ের মধ্যে ওরা সব তন্দ্রার প্রহরী।

হ্যাঁ, একটি শিউলির কথা বলা তো হলো না।
সে সম্বৎসর আমায় অভ্যর্থনা করে,
শরতে বিপুল দেয়, হেমন্তে ও শীতে,
তার নিবারণ নেই, কিছু কিছু দেয়—
ফুলের জঞ্জাল আমি মাড়াই দুপায়ে
যেহেতু ঘরের মধ্যে আছে অবিনাশী দু'বকুল।

উৎসবে

[মামার প্রতি স্মৃতি]

আবার উৎসব হলো আমার বাগানে

অতর্কিত ছিলো ফুল, নিয়ে আসা হয়েছিলো কাকে
মূঢ় মূল ছেঁড়ে-ছিনে, তাকে তোমরা ফুল বলে থাকো?

আমার পিতার মতো ছিলেন তিনিও,
সুতরাং গান গেয়ে তাঁকে তো ভরাট করা গেছে—
পৃষ্ট গান, কখনো কীর্তন,
সেদিন কীর্তন দিয়ে তাঁকে তো বাঁধিনি,

ভোরাই গেয়েছি আমি অবিরত শ্মশানভূমিতে!
তারপর ফিরে এসে যে যার বাড়িতে চলে গেছি।
কিন্তু এ সন্তপ্ত প্রাণ কোথা যাবে? ছিলো সর্বক্ষণ,
জানিনা, কী ক্ষমা চেয়ে আমরা প্রত্যাতি বলে আছি,
এতো ব্যক্তিগত এই পদ্য, তাতে পরিত্রাণ পাবো।
যুবক বয়সে আমি সেরকম উন্মাদ বহেছি
শত্রুতাও করে না যাতে মনের সংশ্লেষে বহে চলি।

আবার উৎসব হবে আমার বাগানে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : ১২৫ বর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুধীর চক্রবর্ত্তী

একেকটি বছর এগিয়ে আসে, সমাসন্ন হয়ে ওঠে একেকটি ব্রতপালনের শুদ্ধ সানন্দ উপলক্ষ। এই যেমন এ বছরের ৪ঠা শ্রাবণ এসে গেল কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) ১২৫তম জন্মবর্ষের দিন। রবীন্দ্রনাথের দু'বছরের অনুজ এই বিখ্যাত কবি, নাট্যকার ও গীতিকার নানা কারণেই আমাদের আগ্রহ ও বিবেচনার, বিতর্ক ও বিচারের কেন্দ্রে রয়ে গেছেন এত বছর ধ'রে, এতেই বোঝা যায় তাঁর সৃজনের গুরুত্ব। কেউ কেউ অবশ্য এমনও ভাবেন যে, সূর্যের পাশে অমার্জনীয় কলঙ্ক রেখার মতো রবীন্দ্রনাথের পাশে দ্বিজেন্দ্রলালের অবস্থান কিছুটা মালিন্যময় ও সকরুণ। যাঁরা তথ্যভিজ্ঞ তাঁরা অবশ্য মনে রাখেন, পরিপূর্ণ বিকাশের আগেই প্রয়াত হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল পঞ্চাশ বছর বয়সে। রবীন্দ্রনাথ তখনও নোবেল লরিয়েট হননি। বাংলা রঙ্গমঞ্চকে জনপ্রিয়তায় দোলায়িত ক'রে বড়ো অকালে বিদায় নিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তখনও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনজনিত দেশোদ্দীপনার মন্ত্র স্তিমিত হয়নি, সাময়িক উত্তেজনা আর তাৎক্ষণিক আবেগে দেশ টান টান, রবীন্দ্র পরিমণ্ডল তেমন ক'রে গাঢ় আসন পাতেনি। তাঁর অবগুণ্ঠিত সৌন্দর্যময় কাব্যের মূল গূঢ় উচ্চারণ বঙ্গবাসী তেমন ক'রে বোঝেননি। তাঁর ছোটগল্প, নাটক ও গান তখনও গরিষ্ঠসংখ্যক রুচিমান বাঙালির পক্ষে নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য হয়নি। কেবল স্বদেশী গান রবীন্দ্রনাথকে জনগণচিত্তে আসন দিয়েছে এবং কবিতা। মূলত তাঁর পরিচয় তখনও কবির এবং সুকণ্ঠ গায়কের। এক বিশেষ সুরের বিশেষ ধরনের নবীন কবিতা তাঁর, যার মর্ম বুঝছেন লোকেন পালিত, প্রিয়নাথ সেন, প্রমথ চৌধুরী, অসিত চক্রবর্তী কিংবা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের মতো হাতে-গোনা কাব্যরসিক। রবীন্দ্রনাথ তখন লণ্ডনে, তাঁর কবিতার ভাবসম্পদ বিপুল আলোড়ন তুলেছে বিদেশী কাব্যরসিকদের চিত্তক্ষেত্রে, আর ছ'মাস পরে তিনি পাবেন নোবেল পুরস্কার, এমন সময়ে ওরা জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ (১৭ মে ১৯১৩) দ্বিজেন্দ্রলাল আকস্মিক সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন।

তাঁর জীবনের শেষ সাতবছরব্যাপী সময় অকারণ ব্যয় হয়েছে রবীন্দ্রনাথের

কাব্যাদর্শের সঙ্গে বিরোধে ও সংঘর্ষে। ফলে তাঁদের প্রথম যৌবনের প্রবাদপ্রতিম সখ্য পরিণত হয়েছিল বেদনাদায়ক ভুল বোঝাবুঝিতে। এখন হাতে-পাওয়া সব তথ্য প্রমাণ ঘেঁটে আমরা বুঝতে পারি এই শোচনীয় বিরোধ-বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তি-ভূমিকার চেয়ে বড় হয়েছিল তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহচরদের উস্কানি। তবু, ভেঙেপড়া তাঁদের সম্পর্ক জোড়া লাগতে পারত হয়তো। দ্বিজেন্দ্রলাল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লিখেছিলেন মৃত্যুর অল্পকাল আগে, 'আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ আজ knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।' দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন থেকে শ্রদ্ধাপূর্ণ এক চিঠি লেখেন তাঁকে। রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়কে পরে জানান : 'শুনেছি সে পত্র তিনি মৃত্যুশয্যায় পেয়েছিলেন এবং তার উত্তর লিখে ছিলেন। সে উত্তর আমার হাতে পৌঁছয়নি।'

রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, 'তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্বে দুএক খানা পত্র লিখতে ব্যস্ত ছিলেন—তার মধ্যে আমার ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের নামে এক পত্র।... এই দুই কবির মধ্যে কিছুকাল মতান্তর মনান্তর ঘটেছিল—এই পত্রই বুঝি বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনের চেষ্টা—বিগ্রহের সন্ধিপত্র।' যাই হোক, শেষপর্যন্ত এই চিটি দুষ্পাঠ্যই থেকে গেছে এবং প্রাপকের কাছে পৌঁছোয়নি, কেননা দ্বিজেন্দ্রলালের সন্ন্যাস রোগের প্রতিক্রিয়ায় সমবেত ব্যক্তিরা তাঁর মাথায় এত জল ঢালেন যে পত্রটি সম্ভবত ধুয়ে যায়। সত্যেন্দ্রনাথ আক্ষেপ ক'রে জানিয়েছেন : 'রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন তার নামটি কেবল পড়বার মত ছিল—ভিতরকার কথাগুলো আর পাওয়া গেল না।'

এ আক্ষেপ অবশ্য সকল রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র অনুরাগীর। চিঠির দৌত্য সফল হলে এবং দ্বিজেন্দ্রলাল অকালে প্রয়াত না হ'লে হয়তো আবার মিলতেন দুই প্রতিভাসম্পন্ন সমকালীন তাঁদের প্রথম যৌবনের মিলনমুখর পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের সমতলে। অবশ্য কী হতে পারত তার জন্য খেদপ্রকাশ করে আজ কোনো লাভ নেই কিন্তু দুজনের সম্মিলনের এই ব্যর্থতা হয়তো নিয়তি-নির্দিষ্ট। তাই আজ সারা দেশের ব্যাপক রবীন্দ্রসমাদর কিংবা রবীন্দ্রগ্রস্ততার মধ্যে দ্বিজেন্দ্র-লালের সম্পর্কে করুণ অনাদর ও উপেক্ষা অনেকটাই শোচনার বিষয়।

সেই শোচনার পটভূমিকা ঘটনাবহুল ঐতিহাসিকতায় ঘেরা। আজ যাঁরা রবীন্দ্রনাথ আর দ্বিজেন্দ্রলালের যুগের অনেক পরবর্তীকালের তাঁরা তো বিরোধ-সংঘাতের বাতাবরণে ঐ দুজন বড় মাপের শিল্পীকে বিচার করবেন না। অবশ্য

ইতিহাসের খাতিরেই আমাদের মনে রাখতে হয় যে, নিশ্চিতভাবে রবীন্দ্রবিদ্বেষের কারণেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রয়াণের পর প্রাপ্য মর্যাদা ততটা পান নি। কারণ ইতিমধ্যে পট পাল্‌টে গেছে। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টির মহিমা, নোবেল পুরস্কারের পর তাঁর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, তাঁর আশিবছরের ফলবান জীবন, তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত-মণ্ডলীর প্রয়াস এবং এ দেশের আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্যের ভিত্তিমূলে রবীন্দ্রনাথের নিঃসংশয় ও স্বতঃস্ফূর্ত নেতৃত্বের আসন এখন এতটাই দৃঢ় যে দ্বিজেন্দ্রলাল আর তাঁর সমগ্র কৃতি ও কৃতিত্বকে মেনে নিতে হয়েছে অনিবার্য নির্বাসন। অথচ নিরপেক্ষভাবে বলা চলে, তাঁর প্রতিভা ও প্রয়াস বোধহয় এতখানি উপেক্ষণীয় ছিল না।

মাঝে মাঝে আবার এমনও মনে হয় যে, শুধু স্বল্পায়ুজীবন এবং রবীন্দ্র-বিরোধিতা নয়, দ্বিজেন্দ্রলালের নির্বাসনের আরও কতকগুলি কারণ ছিল। তিনি তেমনভাবে ক্রমাগ্রসরমান আধুনিকতাকে অনুধাবন করতে পারেননি। তাই যে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা'র মতো নাটক কিংবা 'গোরা'-র মতো উপন্যাস লিখেছেন, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন 'মেবার পতন' বা 'সাজাহান'-জাতীয় উত্তেজনাবহুল মঞ্চসফল নাটক। এছাড়া তাঁর জীবনবৃত্তান্ত অনুধাবন করলে দেখা যাবে, তাঁর যখন চল্লিশ বছর বয়স, সেই ১৯০৩ সালে পত্নীবিয়োগের আঘাত বাকি দশ বছরের জীবনে কিছুতেই আর শমতা পায়নি। এই সময় তিনি জড়িত হয়ে পড়েন বাইরের উত্তেজনায়, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনজনিত স্বদেশীস্রোতে, রঙ্গমঞ্চের তাৎক্ষণিক জন-প্রিয়তার ঝোঁকে এবং মদ্যপানে। লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রথম যৌবন থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ও প্রীতিরত এই মানুষটি জীবনের ঐ অস্থির জীবন-যাপনের প্রতিক্রিয়ায় এবং তথাকথিত শুভার্থী সহচরদের প্ররোচনায় জড়িয়ে পড়েন দৃষ্টিকটুরকম রবীন্দ্রবিরোধিতায়। তাঁর জীবনের দুটি বড় ঘটনাকে মনে রাখা দরকার এই প্রসঙ্গে। প্রথমত, মেধাবী ও বিলাতপ্রত্যাগত সুশিক্ষিত দ্বিজেন্দ্রলাল সারাজীবনে কোনো অনুকূল জীবিকা পাননি। বিদেশী সরকারের জরিপ ও রাজস্ব বিভাগে চাকরির ক্ষেত্রে তাঁর মতো স্বাধীন ও স্পষ্টবক্তা ব্যক্তির পক্ষে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারবার মতান্তর ও মনান্তর হয়। তার ফলে শেষপর্যন্ত তাঁকে স্বেচ্ছাঅবসর নিতে হয় এবং তার আগে সাতাশ বছরের কর্মজীবনে তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক বদলীর নিগ্রহ। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : 'ক্রমাগত transfer (বদলি) আমাকে যথার্থই যেন অস্থির করে তুলেছে।' এই চাকরিকে তাঁর সারাজীবন মনে হয়েছিল 'দাস্য'। দ্বিতীয়ত

তাঁর আরেক বেদনা যৌবনে পত্নীমৃত্যু এবং তার ফলে নির্বান্ধব প্রবাসে দুটি অসহায় শিশু পুত্রকন্যার দায়। মানুষটি ছিলেন প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ ও স্নেহশীল অথচ স্বভাবে সৌন্দর্য মুগ্ধ রোমান্টিক। ষোলো বছরের নিশ্চিন্ত নির্ভরতাময় দাম্পত্য জীবন যে-শিল্পীকে ভরিয়ে রেখেছিল আনন্দে-গানে-সৃজনে-বন্ধুতায়, আকস্মিক মৃত্যুর রূঢ় বাস্তব তাঁকে সেখান থেকে ভ্রষ্ট ক'রে, তাঁর জীবনের ভরকেন্দ্র ভেঙে তাঁকে একেবারে নিঃস্ব করে দেয়। আমাদের মনে থাকে, তাঁর ছিল না শান্তি-নিকেতনের মতো চিত্তবিশ্রাম ও কর্মের কেন্দ্র, ছিল না অনুরাগী আশ্রম সহচর। প্রবাসে, দাস্যময় চাকুরি আর পরিজনহীন নিঃসঙ্গ সংসারের কলুষ, নির্ভরতাশূন্য সন্তানদের দৈনন্দিন অসহায়তার দর্শক এই ভাবপ্রবণ মানুষটি একেবারে ভেঙে পড়েন। কয়েকটি লঘু উত্তেজনা এই সময় থেকে তাঁকে গ্রাস করে।

তার মধ্যে একটি মদ্যপান। স্ত্রীর প্রয়াণের তিন বছরের মধ্যে, তাঁর তেতাল্লিশ বছর বয়সেই, শ্রান্ত দ্বিজেন্দ্রলাল ১৯০৬ সালে এক চিঠিতে লিখেছেন : 'মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আমার জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। এখন এ জীবন কেবল ধারণ করা মাত্র। এরপরে ১৯০৭ সালে একটি চিঠিতে লিখেছেন 'আপন মনের দিকে চেয়ে দেখি সেখানে ও সংসারের উপরে অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা ছাড়া আর তো কিছুই খুঁজে পাই না। আসক্তি বা ভোগলিপ্সা তিলার্ধ নাই। তবে, কেন—কিসের জন্য এই পুঞ্জীভূত বিড়ম্বনা নিরন্তর ভোগ করে মরি ?' জীবন সম্পর্কে একটা শূন্যতাবোধ, এই নির্বেদ, কেমন করে মহৎ শিল্পের দিকে তাঁকে টানতে পারে ? তাই এই আত্মিক অবসাদ আর মর্মান্তিক বিষাদ সাময়িকভাবে মোচন করতে তিনি মাদকের অনিবার্য বন্ধনে ধরা দেন। তার সমর্থনে বন্ধুকে লেখেন : 'তোমাদের স্ত্রী আছেন, সংসারে অন্যান্য নানারূপ আশ্রয় অবলম্বন আছে ; কিন্তু আমার তার কোনটাই নাই, কিছুই নাই। এইজন্য ভয়ানক ঔদাস্য ও অবসাদ আসিয়া যখন আমার দেহ-মনকে অভিভূত করিয়া, জড়াইয়া ধরে তখন —In order to shake off that lethargy, dulness depression আমার একটু একটু পান করার দরকার বোধ করি। ওটা যে আমার পক্ষে শুধু একটা support and strength (সহায় ও বল) তা নয়, Necessityও (প্রয়োজন) বটে।'

শেষ দশ বছরের জীবনে (১৯০৩-১৯১৩) পত্নী-বিরহিত দ্বিজেন্দ্রলালের এই ভগ্ন বিগ্রহ দেখা যায়, যাঁকে বাঁচার জন্য বাইরে থেকে উত্তেজনা জোগাড় করতে হয়। সেই উত্তেজনা হ'তে পারে মদ্যপানের অনুষঙ্গে, হ'তে পারে বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলনজনিত তৎসাময়িক মত্ত আবেগে, হ'তে পারে কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জনচিত্তজয়ী ঐতিহাসিক ও দেশোদ্দীপনার নাটক লেখায় এবং একই ভাবে হ'তে পারে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে অশোভন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ায়। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর তো অনুদ্বিগ্ন সংযম জীবনের অর্জিত শান্ততা ছিল না, ছিল না আশ্রমিক জীবন নিয়ে কর্ম ও সংগঠনের আহ্বান! অন্তর্মগ্ন সৃজনের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁকে জারিত করতে পারেনি, সঞ্চার করতে পারেনি তাঁর মধ্যে জীবনের বেদনা-বিষাদকে পেরিয়ে যাবার পৌরুষ। পাশাপাশি আমরা দেখে নিতে পারি এমন তথ্য যে, ১৯০২ সালে ২৩ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথেরও পত্নীবিয়োগ হয়েছে, সন্তানদের নিয়ে তিনি বাস করছেন শান্তিনিকেতনে। জানতে পারি, তাঁর মধ্যমা কন্যা রেণুকার গলক্ষত রোগ বাঁক নিয়েছে যক্ষ্মায়, ১৯০৩ সালে সেই ব্যাধিগ্রস্ত কন্যাকে হাওয়া বদল করানো, শুশ্রূষা সবই করছেন তিনি, বহন করছেন তার অসহায় করুণ মৃত্যুর বেদনা (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩)। অথচ সেইসঙ্গে চলছে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য নিয়মাবলীর বিস্তারিত খসড়া রচনা, 'স্মরণ' পর্যায়ের কবিতা, 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের সূচনা, অসুস্থ কন্যাকে সঙ্গ ও আনন্দ দানের জন্য আলমোড়ায় তার শয্যার পাশে থেকে 'শিশু' কাব্যের ৩১টি কবিতা রচনা। এরপরে ১৯০৪ থেকে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে পড়বেন বৃহত্তর আরও নানা ঘটনা ও সৃজনের ছন্দে, লিখবেন 'স্বদেশী সম্পদ' ও 'আত্মশক্তি'-র মতো প্রবন্ধ, প্রবাহ আসবে স্বদেশী গান রচনার, চলবে বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা। এই আত্মনির্ভরতা, কর্মের আহ্বান, সংগঠন ও সৃষ্টির তাপ রবীন্দ্রনাথকে প্রবুদ্ধ করে ভবিষ্যতের আশাবাদে। তিনি এগিয়ে যান সফলতায়, সংগ্রামে, ব্যাপ্তিতে।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের শেষ দশকে কোথাও এই নিশ্চিন্ততার ভরকেন্দ্র ছিল না। অস্থির ও উদ্বেল তাঁর জীবন খুঁজত পরাশ্রয়। তাই দেখতে পাই, তাঁর জীবনের অবসাদগ্রস্ত মলিন পর্বে তিনি রচনা ক'রে চলেছেন কেবলই রঙ্গমঞ্চের চাহিদায় নাটকের পর নাটক—প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), নূরজাহান (১৯০৮), মেবার পতন (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯) ও চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১)। হাসির গানের উৎস গেছে শুকিয়ে, প্রেমসংগীত দুর্লভ, কেবল নাটকের গান আসছে নাটকের প্রয়োজনে। এরমধ্যে একমাত্র কাব্য রচিত হয়েছে 'আলেখ্য' (১৯০৭) যা উন্নত প্রতিভার পরিচয় রাখেনি। অথচ এই শূন্যমনেই তিনি রচনা করেছেন 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গান তার ওজস্বী আবেগ ও সুরের আশ্চর্য বিন্যাসে। কিন্তু তাতেও কাজ করেছিল বাইরের

প্রেরণা। জগদীশচন্দ্র বসু একবার গয়ায় বেড়াতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালকে বলেন 'মেবার পাহাড়' গানে কবিত্ব উপভোগ্য—'কিন্তু যদি আমি মেবারের লোক হতেম তাহলে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটত। তাই আপনাকে অনুরোধ করি আপনি এমন একটি গান লিখুন যাতে বাঙ্গালার বিষয় ও ঘটনা—বাঙ্গালীর বিষয় ও ঘটনা থাকে'।

এর অল্প কদিন পরে একদিন দুপুরে মধ্যাহ্নভোজের পর হঠাৎই আধঘণ্টার মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রেরণায় 'বঙ্গ আমার' গান লেখা হয়। গান তাঁকে এতটাই উজ্জীবিত করতে পারত যে ঐ ভয়ানক নৈরাশ্যমণ্ডিত জীবনপর্বেও 'আর কিছু না বলিয়া, হাততালি দিতে-দিতে, সারাটা ঘরময় ঘুরিয়া-ঘুরিয়া, নাচিয়া-নাচিয়া, আবার গাহিতে লাগিলেন'। আশ্চর্য যে, দ্বিজেন্দ্রলালের দেশোদ্দীপনার যেসব গান ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের উত্তেজনায় লেখা হয়েছিল তা 'ইংরেজ শাসকের ভয়ে রাজকর্মচারী দ্বিজেন্দ্রলাল সেসব পুড়িয়ে ফেলেন।' অবশ্য পরবর্তীকালে রচিত দুখানি স্বদেশী গান তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। 'আমার দেশ' (১৯০৭) এবং 'আমার জন্মভূমি' (১৯০৯) তাঁর সংগীতপ্রতিভার অসামান্য স্মারক।

অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ মানুষের মধ্যে স্বভাবের একটা প্রান্তিকতা দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে এই ব্যাপারটা একটু বেশি ছিল। তাঁর উনিশ বছর বয়সে প্রকাশিত 'আর্যগাথা' (১৮৮২) প্রথমখণ্ডে নানারকম গান ছিল ১০৮ খানি। তার ভাববস্তু নিসর্গমুগ্ধতা, ঈশ্বরপ্রেম ও স্বদেশস্তুতি, কিন্তু প্রেমের গান ছিল না। এ সম্পর্কে তাঁর প্রান্তবাদী মন্তব্য : 'যতদিন না দুঃখিনী মাতৃভূমির এই দুঃখ, দৈন্য ও হীনতা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় ততদিন ভারতবাসীর মুখে প্রেম-সংগীত ভাল দেখায় না।' বলা বাহুল্য এ-মনোভাব বেশিদিন টেঁকেনি, তাঁর রচিত প্রেমের গান আমাদের মুগ্ধ করেছে। তেমনই বিলাতে গিয়ে ইংরাজি গান শোনা ও সে সম্পর্কে পূর্বাপর তাঁর ধারণা এইরকম যে, 'আমি সলজ্জে স্বীকার করি যে, এককালে আমারও ইংরাজি গানে বিশুদ্ধ ও আন্তরিক ঘৃণা ছিল। আমি যেদিন ইংলণ্ডের সর্বপ্রধান সংগীত-রচয়িতার রচিত সর্বোত্তম Oratoria শুনিতে টিকিট কিনিয়া আলবার্ট হলে প্রবেশ করিলাম ও গুটকতক গানও শুনিলাম সেদিন ইংরাজি সংগীতের হীনত্ব ও অপদার্থত্ব আরও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া গৃহাভিমুখে দ্রুত পদচারণ করিয়া, একেবারে শয়নকক্ষে উপনীত হইলাম এবং কেন যে লোকে পয়সা ব্যয় করিয়া এরূপ সংগীত শোনে, ইহা পর্যালোচনা করিতে করিতে শয়ন করিয়া কতক শান্তি উপভোগ করিলাম।··· ক্রমে বিলাতপ্রবাসে নানা বন্ধুর নিকটে

ছোটখাটো ইংরাজি গান শুনিতে শুনিতে ভাবিলাম, "বাঃ, এ মন্দই বা কি ?" ক্রমে তাহার অনুরাগী হইয়া আরও শুনিতে চাহিতাম; এবং শেষে আমার ইংরাজি গান শিখিবার প্রবৃত্তি হইল ও পয়সা দিয়া গান শিখিতে আরম্ভ করিলাম।'

সাময়িক আবেগের তাড়নায় যাঁর মনোভাব এতখানি উচ্চাবচতা লাভ করে, সন্দেহ কী যে তাঁকে যেকোন বিরোধ-বিতর্কে টানা সহজ, নাট্যমঞ্চের উত্তেজনায় শামিল করা সহজতর এবং তাঁর ঘোষিত নীতিবশ্যতা ও বিচিত্র শুচিতাবোধ কোনো সাময়িক কারণেই যে রবীন্দ্রকাব্যে হঠাৎ লালসার চিত্র ও নীতিহীনতা খুঁজে পেয়েছিল তা নিশ্চিত। তিনি যে রবীন্দ্রবিরোধে বিশেষত প্রতিবাদী রচনায় যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, তার কারণ লোকেন পালিত যেমন বলেছেন, 'He never actually meant anything bad when he wrote it তবে অত strongly চিত্রাঙ্গদা ও রবিবাবুর কথা না বলাই উচিত ছিল—ঐখানেই তাঁর দোষ হয়েছে। কিন্তু দ্বিজু যখন যা'ই ধরতেন Half-heartedly কর্তে পার্তেন না। তাঁর Nature-ই সে বিষয়ে বাধা ছিল।' নির্ভয়ে বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রকাব্যের দুর্বোধ্যতা ও অশালীনতা বিষয়ে তাঁর ক্ষণউত্তেজিত ধারণা 'বিশুদ্ধ ও আন্তরিক' ভাবে বিরোধী ছিল এবং সে-ধারণা কালে অবশ্যই অপনোদিত হতো, কেননা তাঁদের মূলত ছিল এক উজ্জ্বল সখ্য।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সখ্য গড়ে-ওঠার মূলে ছিল অনন্য শ্রদ্ধাবোধ। দুজনেরই ছিল উচ্চকুলজাত অভিজনতা। তাছাড়া কবিতা ও গান রচনা এবং নাট্যপ্রীতি তাঁদের পরস্পরকে কাছে টেনেছিল। দুজনেই বিলাত প্রবাস করেছেন এবং প্রায় একই স্কচ ও আইরিশ গানে মজেছেন। ভবিষ্যতে দুজনেই উন্নতমানের কাব্যসংগীত লিখেছেন এবং গানে মিলিয়েছেন বিলিতিসুরের কিছু কিছু ধরন। তবে মাত্রাগতভাবে বিলিতিসুরের প্রয়োগ দ্বিজেন্দ্রগীতিতে বেশি, বিশেষত হাসির গানে। তবে দীর্ঘ জীবনের আশীর্বাদে, নানা নিরীক্ষার সুযোগে এবং অনুরাগীদের সতর্ক ও সুদক্ষ রক্ষণ-সম্প্রচারে রবীন্দ্রসংগীত আজ বঙ্গসংস্কৃতির এক স্থায়ী শিল্পসম্ভারে পরিণত হয়েছে। অথচ তাঁর নিতান্ত স্বল্পজীবনের অভিশাপে, একমাত্র পুত্রের সন্ন্যাস-গ্রহণে, স্বরলিপির অভাবে এবং অনুরাগীর বিহনে দ্বিজেন্দ্রগীতি তার প্রাপ্যিত উচ্চাসন পায়নি। তাঁর কাব্যগুলির মান বিষয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, তাঁর কাব্যানুভূতির ও প্রকাশভঙ্গির আধুনিকতা বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে, তাঁর নাট্যবিষয় ও তাঁর প্রগল্‌ভ সংলাপবিন্যাস সম্পর্কে থাকতে পারে বিতর্ক। কিন্তু তাঁর সবরকমের গান,

তার অন্তর্গত সুরের পরীক্ষা এবং কম্পোজিশনের অনন্যতা বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। বিশেষত তাঁর জাতীয় সংগীতের প্রচারব্যাপ্তি ও লোকপ্রিয়তা, তার পৌরুষ ও ওজস্বিতা এবং হাসির গানের সাফল্য এখনও অন্য কোনো সংগীতকার অর্জন করতে পারেননি। অথচ এটাও সত্য যে, দ্বিজেন্দ্রগীতির কোনো নির্ভরযোগ্য সংকলন এখনও হয়নি, তাঁর গানের বেশিরভাগ সুর বিতর্কিত, স্বরলিপি অঙ্গুলিমেয়। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বিষয়ে এতখানি অবহেলা ও অবজ্ঞা কি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাপ্য ? সেই উপেক্ষা আর বিস্মরণের একতম কারণ কি সত্যিই এইটা যে, জীবনের অন্ত্যপর্বে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন এক দুর্ভাগ্যজনক সাহিত্যবিতর্কে ? আজকের অতিমাত্রায় রবীন্দ্রগ্রস্ত বাঙালি সমাজে দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা ও তাঁর শিল্পপ্রতিভার পুনরুদ্ধার কি তাই অলীক মনে হয় ?

অথচ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে অনুরাগ ছিল তাঁর 'আর্যগাথা', 'মন্দ্র', 'আষাঢ়ে' কাব্য ও তাঁর হাসির গানের বড় সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে 'বিরহ' নাটক উৎসর্গ করেন, আমন্ত্রণ করেন নানা সুহৃদ-সম্মিলনে। শিলাইদহের হাউসবোটে দুজনে সপরিবারে প্রমত্ত থেকেছেন গানে গানে। তাঁদের ডাকাতে ক্লাবের জন্য রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'আমরা লক্ষীছাড়ার দল' এই গানখানি। পূর্ণিমা মিলনে মধ্যরাত পর্যন্ত দুজনে আসর জমিয়েছেন। খামখেয়ালি সভায় দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গানের বন্যা বহাতেন, তাতে কোরাসের নেতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অন্যতম সহায়ক ছিলেন অতুলপ্রসাদ। তাঁরই সাক্ষ্যে জানা যায়, '…দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিতেন—"হোতে পাত্তেম আমি একজন মস্তবড় বীর" আর রবীন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া কোরাস ধরিতেন—'তা বটেইত, তা বটেইত'। দ্বিজেন্দ্র গাহিতেন—"নন্দলাল একদা করিল ভীষণ পণ", রবীন্দ্র গাহিতেন—"বাহারে নন্দ বাহারে নন্দলাল"।'

দুজনের সম্পর্কের নিবিড়তা জীবনের একটা পর্যায়ে এতটাই ছিল যে শুধু শিল্পসাহিত্যের বিনিময়তার বাইরে তা প্রসারিত হয়েছিল। 'রবিজীবনী' ৪র্থ খণ্ডে প্রশান্তকুমার পাল সবিস্তারে তুলে ধরেছেন শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের আলুচাষের বিবরণ, যার প্রত্যক্ষ উপদেষ্টা ও পরিদর্শক ছিলেন বিলাতফেরত কৃষিবিজ্ঞানী দ্বিজেন্দ্রলাল। অবশ্য এটাও ঠিক, শেষপর্যন্ত দুজনের সখ্যে নিদারুণ চিড় ধরেছিল। 'রবিজীবনী'কার জানাচ্ছেন : 'উল্লেখযোগ্য, 17 Mar 1900 [শনি ৪ চৈত্র]-এর পরবর্তী দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো চিঠি রবীন্দ্র-সংগ্রহে পাওয়া

যায়নি।' তার মানে ১৯০৬ বরাবর দুজনের প্রত্যক্ষ বিরোধ পত্রস্থ হ'লেও তার সূচনা আগেই ঘটা সম্ভব।

সেই বিরোধের ইতিহাস উন্মোচনের উপলক্ষ আজ নয়, আজ বরং তা ভোলবার দিন। তবু সত্যের খাতিরে মনে রাখতে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেমন গভীর স্নেহ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রপুত্র দিলীপকুমারকে, তাঁকে লিখেছিলেন, 'তোমার পিতাকে আমি শেষপর্যন্ত শ্রদ্ধা করেছি' তেমনই ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী ও অন্যান্যদের প্রতি কয়েকটি পত্রাংশে (১৯১৭ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে লেখা) দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গূঢ় ব্যঙ্গ গোপন থাকেনি। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর চার বছর পরে যখন দ্বিজেন্দ্রজীবনী লেখেন দেবকুমার রায়চৌধুরী তখন যশস্বী রবীন্দ্রনাথ তার ভূমিকায় লেখেন : 'দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমরা যে সম্বন্ধ সত্য, অর্থাৎ আমি যে তাঁর গুণপক্ষপাতী, এইটাই আসল কথা এবং এইটাই মনে রাখিবার যোগ্য।' অথচ আশ্চর্য যে, রবীন্দ্রনাথই তা মনে রাখেননি। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর তেইশ বছর পরে কৃষ্ণনগরে সর্বপ্রথম তাঁর স্মরণোৎসব হয় ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে। এই সভার উদ্‌যোক্তা রবীন্দ্রস্নেহধন্য বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এ উপলক্ষে পাঠোপযোগী একটি রবীন্দ্রবাণী চেয়ে পাঠালে পঁচাত্তর বছর বয়সেও দ্বিজেন্দ্রপ্রসঙ্গে স্পর্শকাতর ও ক্ষমাহীন রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'তুমি আমাকে সঙ্কটে ফেলতে চেষ্টা কোরোনা। এ কথা সর্বজনবিদিত যে দ্বিজেন্দ্রলাল দীর্ঘকাল ধ'রে নিরবচ্ছিন্ন তীব্রতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধে কটূক্তি বর্ষণ করে এসেছেন। আমি বোধকরি একবার মাত্র শান্ত ও নম্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছিলুম, তাও তিনি ক্ষমা করেননি—মনে করেছিলেন আমার সেই নম্রতা ঔদার্য্যের আড়ম্বর।··· তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই, কিন্তু তবু যদি তাঁর স্মরণ সভায় প্রশস্তিবাদ করতে যাই সেটা আমার পক্ষে দাক্ষিণ্যের অহঙ্কার প্রকাশের মতো দেখাবে—তিনি বেঁচে থাকলে সেটা তাঁর প্রীতিকর হোতো না।'

আসলে ক্ষোভ নেই বললেও ক্ষোভ ছিল রবীন্দ্রনাথের এবং সেই ক্ষোভের উত্তরাধিকার বর্তেছে পরবর্তী বঙ্গবাসীরও মনে। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের প্রশ্রয় পাননি, আনুকূল্য পাননি, বোধকরি পুরোপুরি ক্ষমাও পাননি। এটাই তাঁর ঐতিহাসিক নিয়তি। ক্ষমাহীন জনসমাজ কখনও যোগ্যকেও পুনরাবিষ্কার করতে চায় না। প্রতিভাবানকেও ঢেকে রাখে মালিন্যের ধূসরতায়।

এই ধূসর পরিপ্রেক্ষিতে এসে যায় আয়োজনহীন তাঁর জন্মবর্ষের ১২৫তম আবর্তন। একজন সারস্বত সাধককে একজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে, জাতীয়

জীবনের একজন হৃদয়বান উজ্জীবককে আমরা এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। যত ভাবালুতার সঙ্গেই ঘোষিত হোক, তবু, 'আমার ধর্ম দেশ', তাঁর বিশুদ্ধ ও আন্তরিক গাঢ় উচ্চারণ। হিন্দু সংগীতে তিনি বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে পুনর্জাগ্রত করেছিলেন। পেশাদারী নাটমঞ্চ তাঁর সময়ে এবং এখনও তাঁর জন-চিত্তজয়ী নাটকের বিনোদনে সমৃদ্ধ। কেবল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজন, তাঁর গানের পুনঃপ্রচার বোধহয় অসম্ভব। কথাটা প্রথম অনুধাবন করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। বলেছিলেন, 'দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারলেই তাঁর যথার্থ স্মৃতিরক্ষা করা হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি যদি আমরা অতি সত্বর স্বরলিপিতে আবদ্ধ না করি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সে সব সুর আমাদের চল্‌তি সুরেতে পরিণত হবে।' এই আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। পাঁচশতাধিক দ্বিজেন্দ্রগীতির মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ সুর রক্ষা পায়নি।

দুর্ভাগ্য ও দুর্বিপাক দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনসঙ্গী ছিল। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে অমরতার আসন যাঁরা লাভ করেন প্রতিভার অকৃপণতার সঙ্গে তাঁদের জীবনে যুক্ত হওয়া দরকার ভাগ্যেরও আশীর্বাদ। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বল্পায়ু দুর্ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনে ১৮৮৭ থেকে ১৯০৩ এই মাত্র ষোলো বছর ছিল সস্মিত ও ফলবান। এই ষোলো বছর সুরবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর প্রণয়মধুর দাম্পত্যে কেটেছে। যদিও ছিল ভিন্নস্বভাবী জীবিকার দাস্য, ছিল প্রবাসজীবন, তবু ছিল শান্ত স্নিগ্ধ গৃহকোণ, উৎসাহী মরমী বন্ধুসঙ্গ, সৃজনের অবিরল ধারা। এই পর্বেই বন্যার ঢলের মতো নেমে এসেছে তাঁর বিচিত্র প্রতিভার তীব্র তরঙ্গবেগ। এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছে কাব্য পর্যায়ে 'আর্যগাথা' ২য় খণ্ড (১৮৯৩), 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯), 'মন্দ্র' (১৯০২), নাটক ও প্রহসন পর্যায়ে 'একঘরে' (১৮৮৯), 'কল্কি অবতার, (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'পাষাণী' (১৯০০), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২) এবং অতি জনপ্রিয় তাঁর 'হাসির গান' (১৯০০)। এরপর ১৯০৩ সালে আকস্মিক পত্নীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উজ্জ্বল সৃজন সমৃদ্ধির সমাপন ঘনিয়ে আসে। এরপরে জীবন বলতে তিনি বুঝেছেন শুধু জীবন ধারণ, সুখ বলতে মনে হয়েছে ফাঁকি, জায়মান অস্তিত্বের বদলে মহাসিন্ধুর ওপারের সংগীত তাঁকে টেনেছে। অথচ স্ববিরোধ এইখানে যে, তিনি সত্যি সত্যিই উদাসী হ'তে পারেননি স্বভাবে ও কর্মে। হয়তো দেশকালের ক্ষণিক উন্মাদনা, রঙ্গমঞ্চের প্রত্যক্ষ জনপ্রিয়তার করতালি কিংবা আত্মপ্রতারক মাদকের অবশ্যম্ভাবী আহ্বান তাঁকে স্বস্থ ও বিবেচনাশীল থাকতে দেয়নি। সেই সংকট সময়ে তথাকথিত তরলমতি অসূয়া-

প্রবণ বন্ধুবর্গ তাঁকে উৎসাহিত করে বিষাদ পরিণামী যুযুধানে। 'আনন্দবিদায়' প্রতীকী অর্থেই তাঁর জীবনের সঙ্গে অঙ্কিত হয়ে যায়। আজ গভীর বিষাদের সঙ্গে এই লুপ্তভাগ্য প্রতিভাবানের কথা মনে আসে।

সাহিত্য বিধাতার বিচার কী নির্মম!

তথ্য সূত্র :

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৯ * রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল : গায়ত্রী মজুমদার * স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ : নিত্যপ্রিয় ঘোষ * রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল : একটি বিতর্কিত সখ্য ও অপ্রকাশিত চিঠি : সুধীর চক্রবর্তী, দেশ, ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৩* রবিজীবনী ৪র্থ খণ্ড : প্রশান্তকুমার পাল।

রবীন্দ্রসংগীত : সুরে ও বাণীর অমল-কমল মালা

আশিস বসু মল্লিক

'সরস্বতীকে শিকল পরাইলে চলিবে না, সে শিকল তাঁরই নিজের বীণার তারে তৈরি হইলেও নয়। কেননা, মনের বেগই সংসারে সবচেয়ে বড় বেগ। তাহাকে 'ইনটার্ন্' করিয়া যদি 'সলিটারি সেলে'র দেয়ালে বেড়িয়া রাখা যায়, তবে তাহাতে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা হইবে।'

[সংগীতের মুক্তি / সংগীতচিন্তা / রবীন্দ্রনাথ।]

গান বা গীত— এই দুটি শব্দ অধুনা একার্থক হলেও প্রকৃতপক্ষে দুটি পৃথক শব্দ ও নিঃসন্দেহে সুপ্রাচীন। বৈদিকসাহিত্যে এ দুটি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, লৌকিক সাহিত্যে তো বটেই। গ্রামগেয় সামগান তথা বৈদিক শাস্ত্রোক্ত গান শুধু এক একটি মন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত : তা কেবল মাত্র কয়েকটি শব্দের সমষ্টি, তবু তাকেই গান বা গীত বলা হত। সাম প্রধানত ঋক-সমূহেরই কোষ বা সংগ্রহ। তফাৎ এই যে, সামের অন্তর্গত ঋক-সমূহ গান করা হত। 'এই মূল ঋক থেকে রূপান্তরিত সামকেই বলা হত যোনীমন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে মূল ঋক ও মূল সাম-এর মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। এককথায় সামবেদ হল ঋক-সমূহের স্বরলিপি। দুটিই সুরেলা আবৃত্তি বা CHANTING-এর পর্যায়ে পড়ে।' [আর্যভারতের সংগীতচিন্তা / রাজ্যেশ্বর মিত্র / পৃষ্ঠা ২৭।] 'বৃত্তি' অর্থে পদসমষ্টি বোঝায়। বেদের মন্ত্রভাগ বিভিন্ন ছন্দে গ্রথিত। এই ছন্দ বজায় রেখে যে উচ্চারণ-বিধি প্রচলিত ছিল, তার স্বরগুলি ছিল উদাত্ত (চড়া), অনুদাত্ত (মাঝা-মাঝি) ও স্বরিত (যাদের আওয়াজ)। একটি মন্ত্র একবার পাঠ করলেই পর্যাপ্ত বোধ হত না ; কার্যকালে তিনটি মন্ত্রকে একত্রিত করে একসঙ্গে পাঠ করা হত, যার অপর নাম ছিল 'স্তোত্র'। স্তোত্রগুলি সাধারণত তিনবার করে পাঠ করা হত, ফলে এর নাম হল 'ত্রিবৃৎ' বা 'ত্রিরাবৃত্তি'। 'ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক একটি স্তোত্র (বৃত্তি) পাঠের পর্যায়ক্রমিক নির্ধারণকেই 'আবৃত্তি' বলে, যদিও পরবর্তীকালে এই বৈদিক পরিভাষাটিকে কেবলমাত্র 'পড়া' বা 'পাঠ'— এই অর্থেই গ্রহণ করা হয়।'

[দেশ পত্রিকা / ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৮৩। পৃষ্ঠা ২৩৮ / রাজ্যেশ্বর মিত্র।] নারদী শিক্ষানুসারে ঋক-আবৃত্তি 'উদাত্ত হচ্ছে আমাদের বর্তমান 'গান্ধার' এবং 'অনুদাত্ত', 'ঋষভ' ও 'স্বরিত' হচ্ছে 'ষড়জ'। একই মন্ত্র যখন সাম হিসেবে গাওয়া হবে, তখন 'উদাত্ত' স্বরটি হবে বর্তমানের 'মধ্যম', 'স্বরিত'—'গান্ধার' ও অনুদাত্ত', বর্তমানের 'ঋষভ'। গানের আর এক প্রকার ভেদের কথা জানা যায়, কোনো কোনো বেদের ব্রাহ্মণ অংশে। এর নাম হল 'আগা' বা 'আগান'। 'আগান' বা 'উপগান' অর্থে গানের কাছাকাছি বা গানের সমীপবর্তী একটি প্রক্রিয়া। যাঁরা বৈদিক মন্ত্রে সুর-সংযোগ করে গাইতেন, তাঁদের 'আগাতা' বলা হত ঠিকই, তবে 'গাতা' বা গায়ক বলা হত না। এর প্রধান কারণ, অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বর থেকে উচ্চস্বরে গাওয়ার যে প্রথা ছিল, যার অপর নাম ছিল 'অভিগান' বা 'উদ্‌গান', 'তার গায়ক অর্থাৎ উদ্গাতাগণ অপেক্ষাকৃত উচ্চ বা উদাত্তস্বরে যেভাবে মন্ত্রকে গানে রূপান্তরিত করতেন, তা প্রকৃত গান বা গীতরূপের চাহিদা পূরণ করত না, যেহেতু গানের তুলনায় তা ছিল অতি সংক্ষিপ্ত সুর। সেইজন্যেই সামগান সম্পূর্ণ লৌকিক প্রথানুসারে অন্যভাবে গঠিত হয়েছিল, যার সঙ্গে উদ্গাতাদের সম্পর্ক ছিল অতি ক্ষীণ।' [তদেব / রাজ্যেশ্বর মিত্র।] সাম গানের ক্ষেত্রে আর একটি পারিভাষিক শব্দ আছে। যাকে বলা হত 'স্তোভ'। উদ্গাতাগণ গানের স্থানে স্থানে 'হুম' 'হাই', 'অহোবা', 'হাউ', 'হিন্মা', 'ইড়া' ইত্যাদি নানাধরনের ধ্বনি। দিতেন। একে হ্রীংকার ধ্বনিও বলা হত। বৌদ্ধ মন্ত্রে 'ওঁ মণিপদ্মে হুম'-এর শেষ শব্দটি এ জাতীয়। আগান বা উদ্‌গান ছাড়াও আর একটি শব্দ প্রচলিত ছিল, যার নাম ছিল—'বিগান'। বিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন স্বর প্রয়োগ করে স্তোত্র গাওয়ার নামই ছিল এই বিগান। এর সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক গেয়রীতিটিকেই বলা হত 'সংগান' বা 'সংগীত'। 'সংগত্যাপি গাতব্যাঃ' অর্থাৎ সমবেত বা সমকণ্ঠে গীত অর্থে সংগীত, যা আজকের ধারণা থেকে কিছু পৃথক অর্থের ছিল। 'সংগীত রত্নাকর' গ্রন্থের নির্দেশানুযায়ী সংগীত বলতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য—এই তিনটিকেই বোঝায়। এটি ভাবার্থ। প্রকৃত অর্থে 'সংগীত' হল সম্মিলিত কণ্ঠের গান।

এখন বিচার্য, এই সামগান-পরম্পরা কতখানি গুরুমুখী অর্থাৎ মুখে মুখে শ্রুতি-সহযোগে যুগ-যুগান্তরে পরিবেশিত, সংরক্ষিত ও সংগৃহীত একটি বিশেষ গায়ন-প্রক্রিয়ামাত্র অথবা সেই আদিকাল হতেই এর নিজস্ব কোনো স্বরলিপিগত কাঠামো প্রচলিত ছিল, সেই সম্পর্কিত আলোচনা। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়-আদি সংগীত-বেত্তাদের মতে 'ভারতবর্ষে স্বরলিপির প্রচলন কখনই ছিল না।' উক্তিটি সম্পূর্ণ

সত্য বহন করে না। বিভিন্ন যাগযজ্ঞে সামগুলি বিশদ ও বহুলভাবে গাওয়া হত এবং বিস্তারিত রীতিতে। 'তখন শব্দগুলিকে ভেঙে নানাভাবে উচ্চারণ করে গাওয়া হত এবং বিভিন্ন শব্দও যোজনা করা হত। কিছু কিছু বিস্তারের মতো পদ্ধতিও যে না ছিল এমন নয়। এই গানে ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ অর্থাৎ মা, গা, রে, সা, খাদের ধৈবত এবং খাদের নিষাদ নির্দিষ্ট নিয়মে গাওয়া হত। এইসব চিহ্ন ও প্রয়োগ অতি পরিষ্কারভাবে বর্ণসমূহের ওপরে বা পাশে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে বসানো হত। গানের পর্বগুলিও ভাগ করে দেওয়া হত, কারণ এই অংশগুলি প্রস্তোত্রা, উদ্গাতা এবং প্রতিহর্তাগণ কখনও এককভাবে, কখনও সমস্বরে গাইতেন।' [দেশ, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৮০, পৃষ্ঠা ১৯১/রাজ্যেশ্বর মিত্র।] বৈদিক যুগে প্রচলিত আরও এক প্রকার গানের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাকে বলা হত 'ধ্রুব গান'। এটি একপ্রকার দেশী সংগীত ছিল বলেই মনে হয়, কিন্তু কালক্রমে তা বৈদিক সংগীতে প্রযুক্ত হয়েছিল এবং প্রযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'দৈবী' আখ্যাপ্রাপ্ত হয়েছিল, যাতে দেবতা ছাড়া অন্যের অধিকার না জন্মায় এই গানাভ্যাসে। 'সামবেদীয় একটি ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—যা পরাচী অর্থাৎ অনুলোমে (চড়া থেকে নীচের দিকে) গীত হত—তা দেবলোকের সঙ্গে যুক্ত। যা প্রতীচ্য অর্থাৎ প্রতিলোমে (খাদ থেকে চড়ার দিকে) গীত হত—তা মনুষ্যলোকের সঙ্গে যুক্ত।' এর পরেই ধ্রুব গানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—'মনে হয় উক্ত ধ্রুব গান মনুষ্যলোকেরই গান ছিল, যা ক্রমে দেবলোকে উন্নীত হয়। এই ধ্রুব গান বহিষ্পাবমান স্তোত্রের ছয়টি সামে আলোচিত হয়েছিল। ক্রমে এই ছয়টি সামই ধ্রুব গান নামে পরিচিতি লাভ করে। পাবমান স্তোত্রগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এগুলি থেকে সোমরস প্রস্তুত করার প্রণালী জানা যায়। সোমরসই বলবীর্যের আধার, তাই সোমকে আন্তরিকভাবে স্তুতি করা হয়েছে। পাবমান স্তোত্রগুলিই সামের স্তবমন্ত্র। এই স্তবমন্ত্রেই দেবগণ প্রজাপতির নির্দেশে প্রকৃত বীর্যসম্পন্ন হয়ে অসুরদের পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।' [দেশ পত্রিকা, ১৩৭৯/রাজ্যেশ্বর মিত্র।]

বৈদিক যুগের সংগীতের এই পরম্পরা বেদোত্তর পৌরাণিক যুগেও অব্যাহত ছিল বলেই অনুমান করা হয়। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন জৈন, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের দৈনন্দিন ও বিশেষ ধর্মীয় উৎসবে অবশ্যপালনীয় রীতিরাগে মন্ত্রোচ্চারণ অথবা ধর্মগ্রন্থ, কাব্যাদি পাঠেও পূর্বোক্ত আবৃত্তি বা CHANTING-এর অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায়। তবে তা প্রকৃত অর্থে সুর-সংবদ্ধ গান কিনা, তা বলা কঠিন

অথবা সেইসব গেয়বস্তুর কোনো স্বরলিপিগত কাঠামো চালু ছিল কিনা, তার কোনো যথোপযুক্ত নজির খুঁজে পাওয়া ভার। যে গেয়বস্তুর পুঁথিগত অকাট্য নজির মেলে, তা হল মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী -আবিষ্কৃত ও ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় -বিশ্লেষিত বাংলাভাষার 'আদিতম কাব্যবন্ধ'—চর্যাগীতি। 'সর্বাংশে এটি বাংলাভাষায় রচিত ছিল কিনা' সে বিষয়ে কিছুটা ভিন্নমত (মহম্মদ শহীদুল্লাহ, রাহুল সংকৃত্যায়ন প্রমুখ) থাকলেও, ৭ম থেকে ১২শ শতাব্দীকালে রচিত এই পদগুলির গীতিরূপ সর্বজনস্বীকৃত। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর 'বাংলার সঙ্গীত (কথাশিল্প)' গ্রন্থে এ বিষয়ে যথেষ্ট মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে—'চর্য্যা গীতরীতি থেকে চর্য্যাগানগুলি আসে নি। আগে গানগুলি রচিত হয়েছে, পরে এগুলির জনপ্রিয়তার জন্যে সঙ্গীতশাস্ত্রে চর্য্যাগীতরীতির স্বতন্ত্র উল্লেখের প্রয়োজন হয়েছে।'

ভারতীয় সংগীত ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনার আঙ্গিকে প্রাক্-কথনটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়িত হল সন্দেহ নেই, তবে সম্ভবত এর প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল সেই ইতিহাস পর্যালোচনার যার পটভূমিতে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি নিহিত রয়েছে—এককালে পরিচিতি ছিল যার 'রবিবাবুর গান' বা 'রবিঠাকুরের গান' অথবা অধুনা-স্বীকৃত রবীন্দ্রসংগীতরূপে। যে গীতিসমগ্রকে 'ছন্দের সূত্রে গাঁথা সুরে ও বাণীর অমল কমল-মালা' বলে অভিহিত করতে সাধ যায়, সেই অপরূপ কাব্য-সংগীত রচনার প্রেক্ষাপট, তার দার্ঢ্য স্বকীয়তা, বাণী ও সুরের অপূর্ব ভাব-সম্মেলন শাস্ত্রীয় সংগীতের উপাদানে রচিত হলেও প্রকাশভঙ্গীর অনন্যতায় যে মহাসংগীত আজও আমাদের মুগ্ধ, তদ্গত ও আবেগ-প্লুত করে রাখে, কিংবা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যার কোমলতম পরশ মনে ও মননে এক ঐশ্বরিক উপলব্ধির দ্যোতনা জায়গায়, সেই সংগীত-আলোচনার সংবেদন-ঋদ্ধ সমীক্ষণ সম্ভব হত না আদৌ। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, হয়তো বা আজও কিছু কূট প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কিছু মানুষের বিভ্রম স্মৃতিতে, যাঁরা কদাপি সংগীতবিদ্বেষী নন, এমন কি শাস্ত্রীয় সংগীতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি বা অনায়াস অধিকার রয়েছে এমন সব ব্যক্তিদেরও সংশয়িত ভাবনায়। বিভিন্ন সংগীত-আলোচনা-গ্রন্থের নিরিখে সেই কৌতূহলী বিষয়গুলির নিম্নলিখিত উপায়ে সন্নিবেশ করা চলে :—

(১) রবীন্দ্রসংগীত, সমসাময়িক অথবা পূর্বে-প্রচলিত বাংলার অন্যান্য গীত-রীতির চেয়ে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা বা অনন্যতা দাবি করতে পারে ?

(২) বাণী ও ভাবের আতিশয্য প্রায়শই কি মূল সুরের (রাগের !) ঠাট বা কাঠামোকে অতিক্রম করে নি, অন্তত কিছু কিছু রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে ?

(৩) যিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের তৎপ্রচলিত ব্যবহারিক ভঙ্গীটিকে কখনো কখনো অধিক ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত, নিষ্প্রাণ ও মৃত উত্তরাধিকার বলে মনে করেছেন, তিনিই তাঁর গীত গ্রন্থাদিতে একদা রাগ-রাগিণীর অনুল্লেখে নির্দেশ দিয়েছেন, অথবা ভবিষ্যতের রবীন্দ্র-শিক্ষার্থীদের কঠোরভাবে স্বরলিপির অনুসরণে গীত-শিক্ষা করতে বলেছেন নিজে অথবা বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের তরফে। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাদুটিকে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত বলা যায় কিনা ?

(৪) রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব গানে তানকর্তব অথবা স্বচ্ছন্দ সুরবিহারের [IMPROVISATION] প্রশ্নে ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শকাতর, প্রাগুক্ত স্বরলিপি-নির্ভরতা কি তাঁর আপন সৃষ্টিকেই বস্তুত যান্ত্রিকতার শিকারে পরিণত করে নি ?

(৫) রবীন্দ্রসংগীতের আদি-পর্বের কিছু গান ব্যতিরেকে সমগ্র রবীন্দ্রসংগীত কতখানি রাগাশ্রয়ী বা শাস্ত্রীয় সংগীত-নির্ভর ? আরও বিশদভাবে বলা যায়, রবীন্দ্রসংগীতে রাগবৈচিত্র্য কতটা প্রাধান্য পেয়েছে ?

(৬) রবীন্দ্রসংগীত যুগাতিশায়ী এক অনন্য সৃষ্টি এ কথা মানি, পরবর্তী প্রজন্মের সংগীতসাধনায় এর প্রেরণাদায়ক অপরিহার্যতা আদৌ স্বীকার্য কিনা ?

স্বল্পপরিসরে আমরা উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে যথোচিত আলোকপাতের চেষ্টা করব। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন-দুটি পৃথক গোত্রের মনে হলেও, প্রকৃত অর্থে এরা একে অন্যের পরিপূরক। প্রস্তাবনা দুটি সম্পর্কে কিছু বলার আগে, হিন্দুস্থানী মার্গসংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধিৎসা, তাঁর পারিবারিক সাংগীতিক পরিমণ্ডল ও গীতচর্চা-সম্বন্ধে আমাদের প্রাথমিক পরিচয় থাকা আবশ্যক। সামান্য জ্ঞানের প্রয়োজন সেযুগের বাংলা গানের বিভিন্ন প্রকারের গায়নরীতি ও সংগীত সাধনা সম্পর্কে। এই বিশেষ রীতির বাংলা গানের শুরু বলা যায় অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে। মুখ্যত রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবুর প্রবর্তিত 'নতুন ঢংএর আখড়াই গানে'র প্রভাবে, যা পাঞ্জাবে-প্রচলিত শোরী মিঞার টপ্পার আঙ্গিকে বাংলাভাষায় রচিত হয়েছিল। এতে 'তৎপ্রচলিত আখড়াই গানে আদিরসের উৎসার কমিয়ে ভদ্র, সুশ্রাব্য ভাষার প্রবর্তন করেন তিনি।' [অবতারণা/বিস্মৃত দর্পণ/রমাকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত/সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।] তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য মোহনচাঁদ বসুর আনুকূল্যে প্রচলন ঘটল 'হাফ-আখড়াই গানের ১৮৯০ সালের পর। প্রায় সমসাময়িক কালী মির্জা ওরফে কালিদাস মুখোপাধ্যায়-গীত টপ্পাঙ্গের বাংলা

গানও এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, যা তাঁর ৪ খণ্ডে প্রস্তুত 'সংগীতরাগকল্পদ্রুমে'র অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতগুরু ছিলেন। এ ছাড়া প্রচলিত ছিল বাঈজী নাচের অনুষঙ্গ হিসেবে খেমটা, আড়খেমটা চালের গান, ঢপ, পাঁচালী, কবিগান, তর্জা, যাত্রাগান ইত্যাদি নানাপ্রকারের গায়নপদ্ধতি। সমান্তরালভাবে জনপ্রিয় ছিল শান্তিপুর অঞ্চলে উদ্ভূত 'খেউড়' গান ও রূপচাঁদ পক্ষীর 'বৈঠকী' গান। বলা যায়, নিধুবাবু অনুসৃত বাংলা টপ্পা গান আরও পরিশীলিত হয়ে গোপাল উড়ে প্রবর্তিত যাত্রাগানে, দাশরথী রায়ের পাঁচালী গানে, শ্রীধর কথক ও মধুকানের টপ্পা গানে, হরুঠাকুর ও রামবসুর কবিগানে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রচলিত বাংলা থিয়েটারের গানে ব্যাপকভাবে স্থান অধিকার করে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত—'কীর্তনে,/বাউলের গানে, সংগীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাঙালীর অন্য সাধারণ গানেও তাই। নিধুবাবু, শ্রীধর কথকের টপ্পা গানে, হরুঠাকুর, রামবসুর কবির গানে সেই যুগল-মিলনের ধারা।' [পত্রাবলী/দিলীপকুমার রায় ও রবীন্দ্রনাথ/সংগীতচিন্তা] কলকাতা ছিল বাংলা তথা তৎকালীন ভারতের রাজধানী, কি রাজনৈতিক অর্থে কিংবা সংস্কৃতির পীঠস্থানরূপেই হোক। কলকাতা বরাবরই উত্তর ও পশ্চিমভারতের হিন্দুস্থানী গানের কলাবৎ-গুণী শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষণা করে এসেছে বিভিন্ন রাজা-মহারাজা, শেঠ ও বেনিয়ানদের সংগীত-রস-পিপাসা নিবারণের অভিপ্রায়ে। এঁদেরই আনুকূল্যে বিভিন্ন জমিদার ও শ্রেষ্ঠীর গৃহে সভা-গায়করূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন পশ্চিমা মুসলমান অথবা অ-মুসলমান গুণী সংগীতশিল্পীরা, নামকরণ হয়েছে সে গানের-'কালোয়াতি' বা 'ওস্তাদী', গান রূপে। অন্যদিকে, সিপাহী বিদ্রোহের আগে থেকেই 'বাবু কলকাতার' বিশিষ্ট নাগরিকেরা প্রধানত নব্যবঙ্গের শিক্ষিত সমাজ মেতে উঠেছিলেন আর এক সংগীতের রসাস্বাদনে। তা হল পাশ্চাত্যের উচ্চাঙ্গ সংগীত, তথা যন্ত্রসংগীতের অনুষঙ্গে গড়া অর্কেস্ট্রা বা ঐকতানবাদনের মোহনীয় সুরমূর্ছনায়। এ সবই বাংলার ও বাঙালির নিজস্ব রুচি ও মানসিকতার উপযুক্ত প্রতিফলন নিঃসন্দেহে, তবে বহুলাংশে বহিরঙ্গীনও বটে। বাংলার আকাশে-বাতাসে, গ্রাম্য কবি, দরবেশ, বাউল ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর গলায়, এদেশের মাটি-জল-হাওয়ার স্পর্শে বাঙালির একান্ত নিভৃত আনন্দে পুষ্টিলাভ করেছিল আরও কিছু অন্য স্বাদের গান। এর মধ্যে বাউল, মুর্শীদা, পীরের গান, ভাটিয়ালী, জারি, সারি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি লোকসংগীত ও বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত এক বিশিষ্ট গায়নরীতি যাকে পদাবলী কীর্তন বলে আজ সমধিক পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের

কবি-মানসের সঙ্গে একদা যেমন সন্ত কবীরের ভজনের বাণী, তুলসীদাসের দোঁহার ভাব-বিনিময় হয়েছিল, তাঁর কিছু গানের ভুবনেও বাউল ও কীর্তনের অমোঘ প্রভাব লক্ষ্য করেছি আমরা, সে গীতরূপের আঙ্গিকেই হোক অথবা বাণী কিংবা ভাবের সহজ প্রকাশেই হোক, সর্বত্রই সেই পারমিতা দীপিত হয়ে উঠেছে।

বাংলা গানের এই চিরায়ত মনোভূমির প্রেক্ষাপটে এবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই শিরোধার্য করা যাক তাঁর আপন কথায়—'আমার ভাগ্যবিধাতাকে আমি নমস্কার করি। আমি যখন জন্ম নিয়েছি, তখন আমাদের পরিবারের আশ্রয় জনতার বাইরে। সমাজে আমরা ব্রাত্য। আমাদের পরিবারে পরীক্ষা-পাশের সাধনা সেদিন গৌরব পায়নি। আমার দাদারা দুই-একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার একটুখানি পেরিয়ে ফিরে এসেছেন ডিগ্রি-বর্জিত নিভৃতে।···আমার ভাইরা দিন রাত নিজের ভাষায় তত্ত্বালোচনা করেছেন, হাস্যরস আস্বাদনে ও উদ্ভাবনে তাঁরা ছিলেন নিবিষ্ট, চিত্রকলাও ইতস্তত অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, তার ওপরে নাট্যাভিনয়ে কারো কোনও সংকোচ ছিল না। আর সমস্ত ছাপিয়ে উঠেছিল সংগীত। বাঙালির স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীত-মুখরতা কোনো বার্তা না পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের মত উৎসারিত হয়েছিল।' [শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান / প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪২।] বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন যে যুগের ধ্রুপদী গানের বিখ্যাত গায়ক। 'প্রত্যহ শুনেছি সকাল-সন্ধ্যায় উৎসবে-আমোদে, উপাসনা-মন্দিরে তাঁর গান।' সেই বিষ্ণুর কাছে অতি শিশুকাল থেকেই দিশি গানের চর্চা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'তারপর যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে, তখন বাড়িতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন যদুভট্ট। [সংযোজনী—যদুনাথ ভট্টাচার্য ওরফে যদুভট্ট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানের প্রথম সুরকার। রাগ-মল্লার।] একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই। সেইজন্য কোনো শেখাই হল না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে চুরিয়ে। ভালো লাগল কাফি সুরে 'ঝমঝম বরষে আজু বাদরওয়া'। রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সংগে দল বেঁধে।' [ছেলেবেলা / রবীন্দ্রনাথ।] বলাইবাহুল্য, যদুভট্ট রচিত কমপক্ষে ৮টি হিন্দি ধ্রুপদের আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছিলেন পরবর্তী-কালে।

আমরা যাকে হিন্দুস্থানী সংগীত বলি, তার মধ্যে দুটো জিনিস রয়েছে ; একটা হল গানের তত্ত্ব, অন্যটা হল গানের সৃষ্টি। গানের তত্ত্বকে অবলম্বন করেই হিন্দুস্থানী গুণী শিল্পীরা অপূর্ব সব গানের জন্ম দিয়েছেন। আর মার্গীয় সংগীতের মূল

ভাবটাই সকল দেশের গানে আপনিই ফুটে উঠেছে কতকগুলো সুসংবদ্ধ স্বরসন্নিবেশে যাকে বলে 'মেল' বা 'ঠাট'। 'এই ঠাটগুলিকে লইয়াই গান তৈরি করিতে হয়। এই ঠাটগুলির আয়তনের উপরই গান-রচয়িতার স্বাধীনতা নির্ভর করে। রাজমিস্ত্রি ইট সাজাইয়া ইমারৎ তৈরি করে। কিন্তু তার হাতে ইট না দিয়া যদি এক একটা আস্ত দেয়াল কিংবা মহল দেওয়া যাইত, তার ইমারৎ গড়ায় তার নিজের বাহাদুরি তেমন বেশি থাকিত না। সুরের ঠাটগুলি ইটের মতো হইলেই তাদের দিয়া ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশ করা যায়, দেয়াল বা আমাদের দেশের গানের ঠাট এক একটা বড়ো বড়ো ফালি, তাকেই বলি রাগ-রাগিনী।' [সংগীতের মুক্তি / সবুজপত্র, ভাদ্র, ১৩২৪।] এই রাগ-রাগিনী সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও বিশ্লেষণ আমাদের সর্বাধিক বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এরই কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি—'রাগ শব্দের গোড়াকার মানে রঙ। [সংযোজনী—রঞ্জয়তে ইতি রাগঃ।] এই শব্দটা যখন মনের সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয় তখন বোঝায় ভালোলাগা। বাংলায় রাগ কথাটার মানে ক্রোধ। এই দুয়ের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। এই দুটি ভাবেই চিত্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এই দুয়েরই এক রঙ; সেই রঙটি রাঙা। ওটা রক্তের রঙ, হৃদয়ের নিজের আভা।' [তদেব] এই রাগ-রাগিনী সৃষ্টির যাথার্থ্য ও উপযুক্ততা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় কিছু বক্তব্য আজও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে, অভিনবত্বের স্বাদ বহন করে আনে। যিনি ঔপনিষদিক ভাবনায় প্লুত, আত্মার 'অনোরণীয়ান মহতো মহীয়ান' এর ব্যাখ্যায় সতত-নিয়োজিত, তাঁর হার্দকণ্ঠেই রাগ-রাগিনীর স্বরূপ-কথন নিম্নপ্রকারের—'আমাদের মতে রাগরাগিনী বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আছে। সেইজন্য আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, তা যেন সমস্ত জগতের। ভৈরো যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ, পরজ যেন অবসন্ন রাত্রি শেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গীবিহীন অসীমের চিরবিরহবেদনা; মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিগন্তের ক্লান্তিনিশ্বাস; পূরবী যেন শূন্যপথচারিনী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন। ভারতবর্ষের সংগীত মানুষের মনে বিশেষভাবে এই বিশ্বরূপটিকেই রসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে।' [তদেব] অথচ আমাদের দেশে আবহমান কাল ধরে রামায়ণ ও মহাভারত সুরে গাওয়া হয়, তাতে কোনো রাগ-রাগিণী লাগে না, যা লাগে তা স্বরমাত্র। আমাদের বেদমন্ত্র-গানও অনুরূপ ভাবের, তার সঙ্গে একটি সরল সুর যেন লেগে থাকে। 'মহারণ্যের মর্মরধ্বনির

মতো, মহাসমুদ্রের কলগর্জনের মতো। তাহাতে কেবল এই আভাস দিতে থাকে যে, এই কথাগুলি একদিন দুইদিনের নহে, ইহা অন্তহীন কালের, ইহা মানুষের ক্ষণিক সুখদুঃখের বাণী নহে, ইহা আত্মার নীরবতারই যেন আত্মগত নিবেদন।' [তদেব]। অথচ এই অমৃতরসসঞ্চারী রাগ-রাগিণী আলাপনের নিষ্প্রাণতা ও যান্ত্রিকতার মাত্রাধিক্য, শাস্ত্রীয় কলাবিদদের অর্থহীন 'রাগ-রাগিণী বাদী বিস্ববাদী স্বরের ব্যাকরণ লইয়া মহাকোলাহল', বংশপরম্পরাগত ঘরানার কূপমণ্ডুকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তিরস্কার বর্ষিত হয়েছে অকৃপণভাবে—'আমাদের দেশে সংগীত শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এতদূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলো সুর সমষ্টির কর্দম এবং রাগ-রাগিণীর ছাঁচ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই।' [সংগীত ও ভাব / ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮ / রবীন্দ্রনাথ।] এই শাস্ত্রীয় সংগীত সম্পর্কে এম্বিধ কুসংস্কার ও আবিলতায় আচ্ছন্ন সংকীর্ণ মনোভাবের প্রকাশে মর্মাহত কবির হার্দ্য কণ্ঠস্বর শুনি—'যে সাহিত্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের রাজত্ব, সে সাহিত্যে কবিতাকে গন্ধাযাত্রা করা হইয়াছে। অলঙ্কারশাস্ত্রের পিঞ্জর হইতে মুক্ত হওয়াতে সম্প্রতি কবিতার কণ্ঠ আকাশে উঠিয়াছে, আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সংগীতকেও খাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া বিবাহ দেওয়া হউক।' [তদেব] সংগীতের সার্থকতা শুধু মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত সুরের উপপত্তিক প্রয়োগ নৈপুণ্যেই শেষ নয়, এর আর একটি প্রায়োগিক দিকও রয়েছে—তা হল শ্রোতার কর্ণ ও মনের সন্তুষ্টি বিধান। সংগীতের নান্দনিক মূল্য বলতে যদি কিছু বোঝায়, তার অনেকখানিই এই শ্রুতিযন্ত্রের পরপারে আমাদের নিভৃত হৃদয়ের গোপন কন্দরের সুখাবেশ এবং সে রাজ্যে আবেগের ভাষারও [Language of emotions] একটা মস্তো বড়ো ভূমিকা আছে, কেননা রবীন্দ্রনাথের মতে 'আবেগের ভাষাই সংগীতের মূল।' অতএব প্রচলিত রাগ-রাগিণী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মগ্ন হলেন তিনি। প্রয়োজন বোধে যে রাগে শুদ্ধ স্বর লাগে না, তাতে তা লাগালেন, বাদী, বিবাদী সম্বাদী স্বরের শ্রবণ সুখদ সংযোজন ও বর্জন ইত্যাদি সাধিত হল। এক জায়গায় স্বভাব-বিরুদ্ধ বিদ্রূপে ঝলসে উঠল তার লেখনী—'আরে মহাশয়, জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কি ঋণে বদ্ধ যে, তাহার নিকট এমন অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে? যদি স্থল বিশেষে মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় কিংবা মন্দ শুনায় না, আর তাহাতে বর্ণনীয়

ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন?' [তদেব]

যিনি মূলত কবি, সংগীতে বাণী বা কথার যথাযোগ্য স্থান সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা থাকার কথা অবিদিত নয়। হিন্দুস্থানী সংগীতের বাণী সেকালে কাব্যসুষমাহীন অশিক্ষিত পটুত্বের শিকারে পরিণত হয়েছিল, কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম সত্ত্বেও। কবির নিজস্ব সংস্কৃতি ও রুচিতে তার অভিঘাত এসে লাগলো হৃদয়ভাবের, রসানুভূতির অনুষঙ্গরূপে। এক জায়গায় তিনি লিখলেন—'বাংলাদেশে হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"—সে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যের মধুচক্র থেকে।···মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে, সেই ভেদ-অনুসারে সংগীতের এই দুইরকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রকাশ দেখা যায় হিন্দুস্থানে আর বাংলাদেশে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে সংগীত কবিতার অনুচর না হোক, সহচর বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত, বাণী তার "ছায়েবানুগতা।"··· বাণীর প্রতি বাঙালির অন্তরের টান, এই জন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না—এইজন্যে বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন। এর প্রমাণ দেখো আমাদের কীর্তনে। এই কীর্তনের সংগীত অপরূপ, কিন্তু সংগীত যুগলভাবে গড়া-পদের সঙ্গে মিলন হয় বলেই এর সার্থকতা। পদাবলীর সঙ্গেই যেন তার রাসলীলা।' [আমাদের সংগীত / রবীন্দ্রনাথ / সবুজপত্র, ভাদ্র, ১৩১৮।] এ সম্পর্কে অন্যত্র তিনি লিখছেন—'তুমি কেন স্বীকার করবে না যে, হিন্দুস্থানী সংগীতে সুর যুক্ত পুরুষভাবে, আপনার মহিমা প্রকাশ করে, কথাকে শরিক বলে মানতে সে যে নারাজ—বাংলার সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমারব্রত তার নয়, যে যুগল-মিলনের পক্ষপাতী। বাংলার ক্ষেত্রে রসের স্বাভাবিক টানে সুর ও বাণী পরস্পর আপস করে নেয়, যেহেতু সেখানে একের যোগেই অন্যটি সার্থক। দম্পতির মধ্যে পুরুষের জোর; কর্তৃত্ব যদিও সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে প্রবল, তবুও উভয়ের মিলনে যে সংসারটির সৃষ্টি হয় সেখানে যথার্থ কে বড়ো কে ছোটো তার মীমাংসা হওয়া কঠিন।···হিন্দুস্থানী সংগীত কেমন জানো? যেন শিব। রাগ-রাগিণীর তপস্যা হল শিব বিশুদ্ধির তপস্যা। কিন্তু, তাইতেই সে মরল। এল উমা, সঙ্গে এল ঐ ফুলের তীরন্দাজ ঠাকুরটি, যার নাম ইংরেজিতে 'প্যাসন' আমি বলি যুগে যুগে ক্ল্যাসিসিজমের শৈব-তপস্যা ভাঙতে হবে এই প্যাসানে,

স্থানুকে করতে হবে বিচলিত। নিষ্ক্রিয় নির্বিচলতার মধ্যেও এক ধরনের মহিমা আছে মানি, সে মহান। কিন্তু সৃষ্টির গতি থামলেই তবে সে স্থিতির নিষ্ক্রিয়তার বৃত্ত হয় পূর্ণ। প্রকৃতি বিনা পুরুষকে চাইলে পরিণাম নির্বাণ-কৈবল্য! সে পথে, অন্তত, শিল্পের মুক্তি নেই।' [পত্রাবলী / দিলীপকুমার রায় ও রবীন্দ্রনাথ / সংগীতচিন্তা।]

তাবৎ ভারতবর্ষের সংগীত থেকে বাংলা গানের যে প্রকারভেদ, তেমনি রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও অন্যান্য প্রচলিত রীতির বাংলাগানের সঙ্গে পার্থক্য সূচিত হল সুর ও ভাবের প্রকাশধর্মিতায়, গায়কী ও সুরের সংবেদনশীলতায়, চিত্ররূপময়তা ও রসানুভূতিতে। শাস্ত্রীয় সংগীতে যাকে বিশেষ এক ঘরানাভুক্ত 'বন্দীশ' বা 'চিজ' বলে পরিবেশন-মুহূর্তে গর্ববোধ করতেন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সংগীত-শিল্পীরা, রবীন্দ্রসংগীতেও তেমনি এক স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ও অনন্যতা প্রতিভাত হল কালক্রমে, যা তৎকালীন গান কিংবা পরবর্তী যুগের সুরদ্রষ্টাদের সৃষ্টিসম্ভার থেকে একেবারেই ভিন্ন চরিত্রের। রবীন্দ্রনাথের গানের বয়স কোনো কোনো ক্ষেত্রে এইসব সৃষ্টির সঙ্গে শতাব্দী-কালের ব্যবধান রচনা করলেও, কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্, রবীন্দ্রসংগীত এখনও সজীব, প্রাণবান ও নবীন, জরার চিহ্ন মাত্র নেই কোথায়ও। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতামতকেই শিরোধার্য করে নেবো বিনা তর্কে যেখানে তিনি বলেন—'আমরা যে গানের আদর্শ মনে রেখেছি, তাতে কথা ও সুরের সাহচর্যই শ্রদ্ধেয়, কোনো পক্ষেরই আনুগত্য বৈধ নয়। সেখানে সুর যেমন বাক্যকে মানে, তেমনি বাক্যও সুরকে অতিক্রম করে না। কেননা, অতিক্রমণের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট করা কলারীতিবিরুদ্ধ। যে বিশেষ শ্রেণীর সংগীতে বাক্য ও সুর দুইয়ে মিলিয়ে রসসৃষ্টির ভার নিয়েছে, সেখানে আপন গৌরব রক্ষা করেও উভয়ের পদক্ষেপ উভয়ের গতি বাঁচিয়ে চলতে বাধ্য।' [কথা ও সুর / রবীন্দ্রনাথ / সংগীতচিন্তা।]

এবার তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নদুটিকে পাশাপাশি রেখে বিচার করা যাক। যিনি তৎ-প্রচলিত হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের অধিক ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত, আচার-বিধির নিষ্প্রাণতাকে একদা দ্বিধাহীনচিত্তে সমালোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, আবার তিনিই নিজের সৃষ্টিকে স্বরলিপির কঠিন নিগড়ে বাঁধলেন কেন? এর উত্তর হয়ত পরবর্তী প্রশ্নটির মধ্যেই নিহিত আছে। একথা আমাদের জানা যে, সেযুগের সুখ্যাত সংগীতশিল্পী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর দুটি গানে [যথাক্রমে, 'অল্প লইয়া থাকি তাই' ও 'যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার'] স্থানে স্থানে তান

প্রয়োগে রেকর্ড করতে চাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সম্মতিদানে বিরত ছিলেন। আমরা এও জানি, তাঁরই গানের একান্ত-অনুরাগী দ্বিজেন্দ্রলাল পুত্র দিলীপকুমারের প্রতি পরিহাসস্বনে অনুরোধ—'দোহাই বাপু, আমার গানের ওপর 'ষ্টিম রোলিং' চালিও না, সে আমার সইবে না' ইত্যাদি কথাবার্তা। এই স্বচ্ছন্দ স্বরবিহার প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি দিলীপকুমারকে লেখেন—'ইংরেজী Improvisation কথাটির তুমি তর্জমা করেছ স্বরবিহার—এও আমি ভালবাসি। এতে যে গুণী ছাড়া পায় তাও জানি ; আমার এমন গান আছে যাতে গুণী এরকম ছাড়া পেতে পারেন অনেকখানি। আমার আপত্তি এখানে মূলনীতি নিয়ে নয়, তার প্রয়োগ নিয়ে।··· কতখানি ছাড়া দেব ? আর কজনকে ? বড়ো প্রতিভা যে বেশি স্বাধীনতা দাবি করতে পারে এ কথা কে অস্বীকার করবে ? কিন্তু, এ ক্ষেত্রে ছোটো বড়োর তফাৎ আছেই।···প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে, গড়পড়তা গায়ক তত খানি স্বাধীনতা চাইলে না করতেই হবে।' [পত্রাবলী / দিলীপকুমার রায় ও রবীন্দ্রনাথ / সংগীতচিন্তা] এই আশংকা থেকেই একদা কবি স্বরবিতানে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ না করার নির্দেশ দেন, স্বরলিপিকে যথাযথ অনুসরণ করার বিষয়ে স্ব-অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তাল সম্পর্কেও অনুরূপ হুঁশিয়ারি জারি ছিল। স্বরলিপি যথাযথ অনুসরণ অর্থই গানের যান্ত্রিকতা নয়, এর বড়ো উদাহরণ পাশ্চাত্যের উচ্চাঙ্গ সংগীতে যথাযথ স্বরলিপি অনুসরণে শিল্পী ও Music Conductor-দের যুগ-যুগান্তব্যাপী অনুশীলনের অভিজ্ঞতা—সেখানে এই বিধিনিষেধ মোটেই কোনো প্রতিভাবান / প্রতিভাময়ী গায়ক / গায়িকা, বাদক / বাদিকার সৃজনী-প্রতিভার গলায় শৃঙ্খলের বাঁধন পরায় না। এই স্বরলিপির বিধিবদ্ধ অনুসরণ, এই স্বচ্ছন্দ স্বরবিহারের স্বাধীনতা না দেওয়া, সবই পড়পড়তা গায়ক বা বাদকের জন্যে, সকলের জন্যে নিশ্চয়ই নয়। স্বচ্ছন্দ স্বরবিহারের যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা বর্তমান নজরুল গীতির ক্ষেত্রে আমরা সবাই টের পাচ্ছি ; এখানে জনপ্রিয়তা ও সর্বজনীনতা নজরুল গীতিকে পরিম্লান করে ফেলছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। রবীন্দ্রনাথের এই সম্পর্কে দূরদৃষ্টি যে কতটা যথার্থ ও বাস্তবোচিত ছিল, আজ 'বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের' লাঞ্ছিত বকলমায় বিভিন্ন শিল্পীর গ্রামাফোন রেকর্ড অথবা Tape / Casette শুনলেই ওয়াকিবহাল শ্রোতা মর্মে মর্মে তা অনুভব করবেন।

এর পরের প্রশ্ন রবীন্দ্রসংগীতে রাগ-নির্ভরতা ও রাগ-বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান। রবীন্দ্রসংগীত আদিতে পুরোপুরি রাগাশ্রয়ী ও তালের যথাযথ ব্যবহারে শাস্ত্রীয়

সংগীতের ধ্রুপদ, খেয়াল বা ঠুংরীর আঙ্গিকে রচিত গান হলেও, রবীন্দ্রনাথের মধ্য অথবা শেষজীবনের রচনায়, তার কোন উত্তরণ ঘটল না কেন—এই জাতীয় কূট সংশয়ে প্রবিষ্ট হবার আগে রবীন্দ্রনাথের গানের জগৎকে সামান্য চিনে নেবার চেষ্টা করা যাক। অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথের গানে তিনটে বিশেষ পর্ব বা 'মোড়' রয়েছে। প্রথম যুগের রচনা প্রধানত ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরী-আশ্রিত হিন্দী গানের সুর ও ভাবকে অবলম্বন করে 'ভাঙা গান'। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর মতে [রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গম / বিশ্বভারতী।] 'এই গান ভাঙা দুরকমে হতে পারে। এক, পরের সুরে নিজের কথা বসানো ; দুই, পরের কথায় নিজের সুর বসানো।' রবীন্দ্রনাথ প্রথমোক্ত প্রথাটি অনুসরণ করেন। হরিদাস স্বামী, তানসেন, সুরতসেন, সদারঙ্গ, তানবরষ, যদুভট্ট ইত্যাদির ধ্রুপদ গানের আঙ্গিকে ব্রহ্মসংগীতগুলি এই পর্বেই রচিত হয়েছিল। এ ছাড়া এই একই সময়ে বিলিতি সুরে প্রধানত 'আইরিশ মেলোডিজ'-এ অনুপ্রাণিত কবি রচনা করেন কয়েকটি গীতিনাট্য। তাঁর মতে—'উড়িয়া চলা যাদের ব্যবসায়, তাহাকে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।' এভাবেই 'গানের সুরে নাট্যের মালা' রূপে রচিত হয়েছিল বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া, তেমনিই 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা'র উদাহরণ হল মায়ার খেলা। কবির শেষ জীবনে এভাবেই প্রথমোক্ত উপায়ে রচিত হয়েছিল শ্যামা, চণ্ডালিকা, নটীর পূজা নামক নৃত্যনাট্য ও দ্বিতীয় প্রথায় রচিত হল শাপমোচন, শেষবর্ষণ, ঋতুরঙ্গের মতো গীতিনাট্য। দেশীয় সুরের সঙ্গে বিলিতি মেলোডির সংযোগে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সাহচর্য ও অনুপ্রেরণায় আরও একধরনের 'ইঙ্গবঙ্গ' সংগীত রচনাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে। এভাবেই ইউরোপিয়ান Church, Chorus বা Harmony-র ভিত্তিতে রচিত হ'ল ৬০-৬৫টি রবীন্দ্রসংগীত। গঠিত হ'ল সঙ্কর রাগ-রাগিণী, যথাক্রমে, স্কচ-ভূপালী, স্কচ-কেদারা, ইতালিয়ান ঝিঁঝিট ও আইরিশ বিলাওল ইত্যাদি। মধ্যপর্বে, নৈবেদ্য-গীতগুলির যুগে মার্গীয় সংগীতের সঙ্গে দেশী গানের আদলে রচিত হ'ল কতকগুলি অবিস্মরণীয় প্রকৃতি ও স্বদেশ-পর্যায়ের গান ; নতুন তালের সৃষ্টিও এই পর্বের অন্যতম ঘটনা। উল্লেখ্য, রবীন্দ্র-সৃষ্ট তালের সংখ্যা ৬টি, যথা (ক) যষ্টী, (খ) রূপকড়া, (গ) নবতাল, (ঘ) ঝম্পক, (ঙ) একাদশী ও (চ) নবপঞ্চক তাল, এর মধ্যে প্রথমটির নামকরণ নিজে করে যেতে পারেননি তিনি। এই কয়টি তালে বেশ কয়েকটি গান রচিত হয়। শেষ পর্যায়ের গানগুলি সম্পর্কেই এক শ্রেণীর সংগীত-সমালোচক ও সংগীতবোদ্ধার অনুযোগ সবচেয়ে

বেশি। এইসব গানে রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে অসম-সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সুপরিচিত রাগ-রাগিণীর প্রয়োজনানুগ রূপান্তর ঘটিয়ে এক অপরূপ সৃষ্টি-ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন, কালের কষ্টিপাথরে যা আমাদের কাছে এক পরম সম্পদরূপে বিবেচিত হবে। সেখানে তানের কূট বাহুল্য নেই, নেই টপ্পা-ঠুংরীর অকারণ তারল্য। গীতিকবিতার সুরভি মাখানো, অন্তরের নিগূঢ় ভাব প্রকাশে ঐশ্বর্যবান, ছোট ছোট তানে-গড়া এই স্বরব্যঞ্জনাময় রবীন্দ্রসংগীতগুলি সমসাময়িকতার প্রশ্নে একমাত্র অতুলপ্রসাদের সৃষ্টি-সম্ভারের সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। শান্তিদেব ঘোষের সাক্ষ্য অনুসারে 'কবি প্রথম জীবনে আনুমানিক ৮০টি রাগে সুর-সংযোজনা করলেও, শেষ পর্বে মাত্র ২০টি রাগকে আশ্রয় করে সুর-সৃষ্টি করে গেছেন। রাগগুলি হল—টোড়ি, ভৈরবী, আশাবরী, ভৈরো, কালেংড়া, সারং, ভূপালী, ইমন-কল্যাণ, ছায়ানট, বেহাগ, খাম্বাজ, বাগেশ্রী বাহার, পরজ, দেশ, পিলু, কাফি, কানাড়া, আড়ানা, পূরবী, মূলতান ও মল্লার।' [রবীন্দ্রসংগীত / শান্তিদেব ঘোষ / বিশ্বভারতী।] এ ছাড়া বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী ও বিভিন্ন ভাষায় রচিত ভক্তি-গীতি, যেমন কর্নাটি, গুজরাটি, মহিশূরী ও নানকের ভজনে কথা বসিয়ে গান রচনা করেন।

একটি প্রাথমিক সমীক্ষা অনুযায়ী [ধীরেন্দ্রনাথ সরকার / রবীন্দ্র সংগীত সমীক্ষা / সুরধুনী পত্রিকা / ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭২।] 'অখণ্ড গীতবিতানে (আশ্বিন, ১৩৭১) প্রায় ২০৬০টি গানের উল্লেখ দেখা যায়। এর মধ্যে ১৮৭৯টি গানের স্বরলিপি (সে পর্যন্ত প্রকাশিত) ৫৯টি স্বরবিতান খণ্ডে গ্রথিত হয়। [অর্থাৎ (২০৬০-১৮৭৯)=১৮১টি গানের স্বরলিপি অপ্রকাশিত ছিল সে-সময়।] এর মধ্যে ১৯টি খণ্ডে (যথাক্রমে ৪, ৮, ৯, ১০, ২০, ২২-২৯, ৩২, ৩৫-৩৮, ও ৪৫) প্রথমদিকে রচিত ৫৪৬টি গানের রাগ-রাগিণী ও তালের নির্দেশ দেওয়া আছে।' দেখা যায়, শান্তিদেব ঘোষ উল্লিখিত ৮০টি নয়, প্রায় ১১৬টি বিভিন্ন রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয় এই ৫৪৬টি গানে সুরসংযোজনার ক্ষেত্রে। তার মধ্যে ৫২টি রাগ-রাগিণীতে মাত্র ১টি করে, ২০টি রাগ-রাগিণীতে ২টি করে, ১১টি রাগ-রাগিণীতে ৩টি করে গান ব্যবহৃত হয়। রাগ-রাগিণীর সংখ্যা অনেক হলেও গানের সংখ্যা বিচারে রবীন্দ্রনাথের বেশি পক্ষপাতিত্ব ছিল দেখা যায়—ভৈরবী (৩৭টি), বেহাগ (৩৫টি), ইমনকল্যাণ (২৯টি), খাম্বাজ (২২টি), বাহার (২০টি), দেশ (১৫টি), রামকেলি (১৩টি), কেদারা (১২টি), ছায়ানট (১২টি), বিভাস (১১টি), যোগিয়া (১০টি), সাহানা (৯টি), সিন্ধু (৯টি) ইত্যাদি রাগ-রাগিণীর প্রতি।

বিচিত্র, স্বল্প-পরিচিত অথবা অ-প্রচলিত রাগ-রাগিণীর ভিত্তিতে রচিত রবীন্দ্র-সংগীতের একটি খসড়া-তালিকা নীচে দেওয়া হল :—

	রাগ	গান
১.	আশা-ভৈরবী	তোমারি নামে নয়ন মেলিনু সহ ৩টি গান।
২.	আনন্দ-ভৈরবী	এস হে গৃহদেবতা।
৩.	ইমন-পূরবী	সন্ধ্যা হল গো মা সহ ৩টি গান।
৪.	কর্নাট খাম্বাজ	আজি শুভদিনে সহ ২টি গান।
৫.	কর্নাটি ঝিঁঝিট	বড় আশা করে।
৬.	কুকুভ	কোথায় তুমি আমি কোথায় সহ ৩টি গান।
৭.	খট	আমার যাবার সময় হল সহ ৯টি গান।
৮.	গারা	কী ঘোর নিশী যে।
৯.	গান্ধারী	কার বাঁশি নিশিভোরে সহ ৩টি গান।
১০.	গৌড়	তুমি জাগিছ কে সহ ৩টি গান।
১১.	গৌরী	আমি নিশিদিন তোমায় সহ ৪টি গান।
১২.	গুণকেলি	জননী তোমার করুণ চরণখানি।
১৩.	জিল্‌ফ	প্রেমের ফাঁদ পাতা সহ ২টি গান।
১৪.	জিল্‌ফ-বাঁরোয়া	প্রতিদিন তব গাথা।
১৫.	জংলা	শরতে আজ কোন অতিথি।
১৬.	টোড়ি-ভৈরবী	অয়ি ভুবনমনমোহিনী সহ ৬টি গান।
১৭.	দরবারী-টোড়ি	ভব কোলাহল ছাড়িয়ে।
১৮.	দেবগিরি	দেবাদিদেব মহাদেব।
১৯.	দেবগিরি বিলাওল	সবে আনন্দ করো।
২০.	দেবগান্ধার	আজি শুভ শুভ্রপাতে।
২১.	দীপকপঞ্চম, মতান্তরে সোহিনী	প্রথম আদি তব শক্তি।
২২.	নটনারায়ণ	আর না আর না ওখানে।
২৩.	নটকিন্দ্র	সাজাবো তোমারে হে।
২৪.	নাচারি টোড়ি	নূতন প্রাণ দাও হে।
২৫.	নায়কী কানাড়া	সুধা সাগর তীরে।
২৬.	পটমঞ্জার	এসো হে সজল-ঘন দিন।

২৭.	পরজবসন্ত	আজি এই গন্ধবিধুর সহ ৪টি গান।
২৮.	পূর্ণ ষড়জ রাগিনী	একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ।
২৯.	বড়হংস সারহ	তাহারে আরতি করে সহ ২টি গান।
৩০.	বসন্ত-ভৈরবী	অজানা খনির নূতন মণির।
৩১.	বাগেশ্রী বাহার	যে রাতে মোর দুয়ারগুলি সহ ৩টি গান।
৩২.	বাহাদুরি টোড়ি, মতান্তরে গান্ধারী	বিমল আনন্দে জাগোরে।
৩৩.	বেহাসড়	শ্যামরে, নিপট কঠিন সহ ৪টি গান।
৩৪.	ভূপনারায়ণ	মোরা সত্যের পরে মন।
৩৫.	মারুকেদারা	অসীম আকাশে অগণ্য।
৩৬.	রাজবিজয়	অজ্ঞানে কর হে ক্ষমা।
৩৭.	ললিতাগৌরী, মতান্তরে বসন্তপঞ্চম	হৃদয় নন্দন-বনে।
৩৮.	লচ্ছাশাখ, মতান্তরে নিশাশাখ	বহে নিরন্তর অনন্ত।
৩৯.	লুম খাম্বাজ	আজি যত তারা।
৪০.	শঙ্করভরণম্	বিশ্ববীণারবে সহ ৩টি গান।
৪১.	শ্যাম	নয়ান ভাসিল জলে সহ ২টি গান।
৪২.	সরফর্দা	দুঃখরাতে হে নাথ সহ ৫ টি গান।
৪৩.	সিন্ধু-বাঁরোয়া	তোরা শুনিস নি কি সহ ২টি গান।
৪৪.	সিন্ধুড়া	হয়েছি ব্যাকুল সহ ৪টি গান।
৪৫.	সিংহেন্দ্রমধ্যম	বাজে করুণ সুরে।
৪৬.	সুহা কানাড়া	নাথ হে প্রেমপথে
৪৭.	হেমখেম	সবে মিলি গাও রে।
৪৮.	স্বরট	কোথা হতে বাজে প্রেমবেদনা সহ ৭টি গান।
৪৯.	যোগিয়া ভৈরব, মতান্তরে ললিত	পান্থ এখন কেন।
৫০.	পরজ-কালেংড়া	আমার প্রাণের পরে।
৫১.	শুদ্ধ বিলাওল	নিত্য নব সত্য তব সহ ২টি গান।
৫২.	দেশগৌড়	আমরা মিলেছি আজ সহ ৩টি গান।

৫৩.	ললিত+বিভাস	পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ।
৫৪.	ললিত+কেদারা+ভৈরবী	সখা, শেষ করা কি ভালো।
৫৫.	ললিত+বিভাস+আশাবরী+যোগিয়া+ভৈরবী	আছে দুঃখ আছে মৃত্যু।
৫৬.	বাহার+ভৈরবী+ভৈঁরো+বাগেশ্রী	এসো এসো বসন্ত ধরাতলে।
৫৭.	ভীমপলশ্রী+পটদীপ+মূলতান+ভৈরবী	প্রখর তপন তাপে।
৫৮.	রামকেলি+পরজ+বসন্ত	কে আমারে যেন এনেছে।
৫৯.	বসন্ত+রামকেলি+সিন্ধু+দেশ	হে নিরুপমা
৬০.	ইমন+পিলু+খাম্বাজ+কানাড়া	ওগো কিশোর আজি।

এবারের প্রশ্ন, রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রজন্মের সংগীত-সাধনায় আদৌ কোন প্রভাব ফেলেছে কিনা? আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীতকারদের ঐতিহ্যানুসারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে গীতিকার ও সুরকার, যেমন এককালে ছিলেন হরিদাস স্বামী, তানসেন, সদারঙ্গ, যদুভট্ট প্রমুখ গুণী শিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও পরবর্তীযুগে সেই একই পরম্পরা প্রাণ পেয়েছে অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল থেকে আরম্ভ করে হাল আমলের সলিল চৌধুরী ও অন্যান্য সুরস্রষ্টাদের বিচিত্রগামী সৃষ্টিমাহাত্ম্যে। এরই পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে দেশীয় রাগ-রাগিণী-প্রণোদিত ও পুরাতনী বাংলা গানের বৈশিষ্ট্যে ভরপুর একপ্রকারের হিন্দি সুর ভাঙা গান, পরবর্তীকালে 'রাগপ্রধান গান' বলে যা আখ্যাত হয়েছে। বিভিন্ন গায়ক-সুরস্রষ্টা যেমন, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, লালচাঁদ বড়াল, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, তারাপদ চক্রবর্তী, শচীন দেব বর্মন ইত্যাদিদের কণ্ঠে এই ধরনের গান চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। জন্ম নিয়েছে আর এক স্বতন্ত্র গীতরীতি, যাকে কাব্যসংগীতের আধারে নব পর্যায়ের গান বা আধুনিক গান রূপে নিজভূমে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন রজনীকান্ত, নজরুল, হিমাংশু দত্ত, সুধীরলাল চক্রবর্তী, সুবল-কমল দাশগুপ্তর মতো সুরস্রষ্টা শিল্পীরা। বাংলা ছায়াছবির সুবর্ণযুগেরও প্রারম্ভ এই 'নস্ট্যালজিক'

দিনগুলোয়। রবীন্দ্রসংগীত-সম্ভারে সমৃদ্ধ সে-সময়কার বাংলা চলচ্চিত্রে এই আধুনিক কাব্য-সংগীতের এক বড়ো মাপের ভূমিকা ছিল, নাটকীয় মুহূর্ত রচনায় ও পরিবেশ-সৃষ্টিতে, কাহিনীর রসোত্তীর্ণতায় কিংবা বাণিজ্যিক সফলতার ইত্যাদি নিরীক্ষার প্রশ্নে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক প্রতিষ্ঠানস্বরূপ, আপন বহুধা-বিকীর্ণ প্রতিভাগুণে। তাঁর আজীবনব্যাপী অনুসন্ধানে-উপলব্ধ জীবনবোধ, যাকে তিনি স্বয়ং 'সীমার মাঝে অসীমের' অনুসন্ধান বলে অভিহিত করেছেন, তার সামনে আমাদের বোধ বা প্রজ্ঞার পরিধিকে নিরতিশয় সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ বলে মনে হয় কোনো অভ্রংলিহ পর্বতশ্রেণীর, আদিগন্ত নীলিমায় নীল সমুদ্রবেলায় অথবা 'গথিক' স্থাপত্যের কোনো সৌধরাজির সামনে দণ্ডায়মান এক ক্ষুদ্র মানবক যেমন আপন অসহায় অস্তিত্বকে পুনরাবিষ্কারে সচেষ্ট হয়। বাংলাদেশের কবি জিয়া হায়দরের মতো আমরাও স্তবের বাণীর আসনে সমাসীন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষটির উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করি আমাদের অবাঙ্‌মনস্‌ গোচরীভূত-অনুভবে, 'যেহেতু জেনেছি আমার অস্তিত্বে তুমি ঈশ্বরের মতো'।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা

১-৪. রবীন্দ্রনাথ / জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, ছন্দ, সংগীতচিন্তা / বিশ্বভারতী।
৫. ঐ / শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান / প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪২।
৬. ঐ / আমাদের সংগীত / সবুজপত্র, ভাদ্র, ১৩২৮।
৭. ঐ / সংগীতের মুক্তি / সবুজপত্র, ভাদ্র, ১৩২৪।
৮. ঐ / সংগীত ও ভাব / ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় / ১২৮৮।
৯. ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী / রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গম / বিশ্বভারতী।
১০. শান্তিদেব ঘোষ / রবীন্দ্রনাথ / বিশ্বভারতী।
১১. ঐ / রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদের প্রভাব / দেশ, বিনোদন সংখ্যা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৯।
১২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় / গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী, ১ম ও ২য় খণ্ড।
১৩. রাজ্যেশ্বর মিত্র / আর্যভারতের সংগীতচিন্তা / লেখক সমবায় সমিতি।
১৪. ঐ / বাংলার সংগীত / কথাশিল্প।
১৫. ঐ / গানের আসর / দেশ, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৮০, পৃষ্ঠা ১৯১।

১৬. রাজ্যেশ্বর মিত্র / গানের আসর / দেশ, ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা ২৩৮-৩৯।
১৭. ঐ / বাংলা গানের আদিপর্ব : উনিশ শতকের বাংলা গান / দেশ, বিনোদন সংখ্যা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ২৯-৩৪।
১৮. রমাকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত / বিস্মৃত দর্পণ / সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
১৯. ধীরেন্দ্র নাথ সরকার / রবীন্দ্রসংগীত সমীক্ষা / সুরধুনী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৭২, পৃষ্ঠা ৪৯-৫৬।
২০. শেফালিকা শেঠ / সংগীতশাস্ত্র কনিকা / ১ ম খণ্ড / ডি. এম. লাইব্রেরী।
২১. কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় / গীতসূত্রসার / উপক্রমনিকা / এ. মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং।
২২. শার্ঙ্গদেব (সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত) / সঙ্গীতরত্নাকর / রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা বিভাগ।

সমরেশ বসু

বাংলা সাহিত্যে যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, এই অকাল মৃত্যুতে সেই সম্ভাবনা অকস্মাৎ লুপ্ত হয়ে গেল। যে মহৎ সাহিত্যের আরম্ভ মাত্র বাংলাভাষায় ধরা রইল, এর বিনাশ হবে না এটুকুই সান্ত্বনা।

বিশ্ব সাহিত্যের একজন সাহিত্যিক বাংলাভাষায় হারিয়ে গেলেন—বাংলাভাষাকে যিনি বিশ্বের দরবারে বড় করে পৌঁছে দিতে পারতেন। সে কীর্তি অতি সামান্য সংখ্যক শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। এর পরের কর্তব্য সম্পর্কে আমরা যেন অবহিত হতে পারি। তাঁর রচনা যতটুকু পাওয়া গেছে তার যথোচিত মর্যাদা দেওয়া ও সুব্যবস্থা আশা করি হবে। সু-অনুবাদ থাকলে তিনি অনেকদিনই বিশ্ব-সাহিত্যিকের মূল্য পেতেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আমার শ্রদ্ধা ও স্নেহের পাত্র ছিলেন, আমি নিতান্তই বেদনাকাতর এই অকালপ্রয়াণ আমাকে দেখতে হলো বলে।

রাধারানী দেবী

কাব্যরত্ন

সমরেশ বসু

অনেকদিন আগের কথা। আমার সদ্য কৈশোরে তখন স্বরভঙ্গের ইঙ্গিত। শরীর সহসাই কিছুটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শৈশবটা একেবারে ছেড়ে যায়নি। কৈশোরের পক্কতা দেখা দিতে শুরু করেছে। কথাবার্তায় ছেলেমানুষি যায়নি। অথচ ভারিক্কি চালে কথা বলবার একটা প্রবণতা চেপে রাখা যাচ্ছিল না।

এ বয়সটা বড়োদের কাছে একরকম চক্ষুশূল। সকলেরই দৃষ্টিতে ভ্রূকুটি। বালকের ছেলেমানুষিও কারোর ভালো লাগে না। আবার গম্ভীর বিষয় নিয়ে কিছু বলতে গেলেও ধমক খেতে হয়। তার মধ্যে আমি আবার বাড়ির আর দশটি ছেলেমেয়ের মতো পারিবারিক নিয়ম নীতিগুলো মেনে চলার তেমন পক্ষপাতী ছিলাম না। এমনটা যে কেন হয়েছিল, আজ পর্যন্ত তার যথার্থ জবাব খুঁজে পাইনি। সবাই যখন অঙ্কের জটিল ফলাফল নিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছে, ব্যাকরণের ক্রিয়াপদ অব্যয় ইত্যাদি নিয়ে বাক্যের দুরূহ জটিলতাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে, আমি তখন রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের চরিত্রে মাথা খুঁড়ছি। দুঃসাহস এতোটাই, এমন কি একটা হাতে লেখা পত্রিকা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি যখন প্রকাশিত হলো, সেই দিনই প্রথম জানা গেল, এ ছেলে গোল্লায় গেছে। কিন্তু এমন দু-চারজনকে পাওয়া গিয়েছিল, যাঁরা বিস্মিত প্রশংসায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। নিজের বয়সী একটা দল তো ছিলই। তারা সকলেই কবি সাহিত্যিক ছবি আঁকিয়ে। তবে আমার মতো একেবারে ইস্কুলের দরজা ভুলে যাবার মতো কেউ ছিল না।

মনে আছে, হাতে লেখা পত্রিকাটি নিয়ে, বড়োদের মধ্যে যিনি প্রথম মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রশংসা করেছিলেন, তাঁর নাম সারদাচরণ কাব্যরত্ন। তিনি একটি ইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সেটা তাঁর বড়ো পরিচয় ছিল না। তিনি একজন কবি, সেটাই তাঁর বড়ো পরিচয়। তাঁর সেই যৌবনের চেহারাটি এখনও আমার চোখে

[একজন কবিকে নিয়ে এই গল্প। সম্ভবত এটিই সমরেশের একমাত্র গল্প যেখানে তিনি কবিতা ও কবিকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। গল্পটি বিভাবের ষোড়শ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।]

ভাসে। ইদানীংকালের শৌখীন বাহান্ন ইঞ্চি ধুতি আর কলিদার ফিনফিনে পাঞ্জাবির কথা ভাবলে চলবে না। যেমনটা দেখা যায় বিয়ের বর বা অভিনেতাদের গায়ে।

তিরিশের দশকের শেষ দিকের কথাটা মনে রাখা দরকার। সেই সঙ্গেই সারদাচরণ কাব্যরত্নের আর্থিক সঙ্গতি। আসলে তিনি ছিলেন এক পাল বংশের সন্তান। আমাদের ছোট মফস্বল শহরে পালেরা প্রাচীন পরিবার। ধানকল, ভুষিকল, মুদী দোকান, এইরকম সব নানাবিধ ব্যবসা ছিল সেই পরিবারের। লক্ষ্মীর সঙ্গে যতোটা সম্পর্ক, সরস্বতী ততোটাই দূরে ছিলেন। সব শরিকের অবস্থা একরকম ছিল না। তবে ব্যবসাই ছিল তাদের বংশগত জীবিকা। হাঁটুর ওপরে ধুতি, হাফহাতা পাঞ্জাবি, আর সকলেরই প্রায় গলায় তুলসীর মালা। আমাদের বাড়িতে শুনতাম, ছোটো জাত।

ছোটো কি বড়ো জাত, সেটা আমার বিচারের দরকার হয়নি। কারণ, আমি জানতাম সারদাচরণ পাল কাব্যরত্নকে! তিনি কোঁচা দিয়ে ধুতি পরতেন। মাটিতে লুটাতো না বটে, ছুঁই ছুঁই করতো। গায়ে থাকতো ধবধবে শাদা পাঞ্জাবি। গলায় একটি শাদা উত্তরীয়। পায়ে বিদ্যাসাগরীয় চটি। চোখে চশমা। চশমাটায় কোনো পাওয়ার ছিল না। চোখ তাঁর ভালোই ছিল! অন্তত আমার দেখা তাঁর প্রথম যৌবনে। মাথার চুল তাঁর কোনোকালেই খুব ঘন ছিল না। বিশেষ করে, তাঁর চওড়া কপালের সঙ্গে, অকাল বয়সেই সামনের চুল উঠে গিয়ে একটি মাঠ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তিনি বিশেষ কারুমিতির দ্বারা, সামনের ফাঁকা জায়গাটি ঢাকা দিয়ে রাখতেন। তবে পিছনে, ঘাড়ের দিকে দীর্ঘ চুল ছিল বেশ ঘন। ধূমপান করতেন না। অল্পবিস্তর পান চিবোতেন। আর নস্যি নিতেন। বিশেষ করে, কবিতার বিষয়ে গভীর ভাবাবেগে কিছু বলবার আগে, একদলা নস্যি নাকে গোঁজা ছিল একেবারে অনিবার্য।

আমি যখন হাতে লেখা পত্রিকা বের করলাম, তখন আমাদের কাছে তিনি প্রতিষ্ঠিত কবি। ছাপার অক্ষরে তাঁর বেশ কিছু কবিতা নানা পত্রপত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো। তিনি যখন যেখানে যেতেন, সেই সব পত্রপত্রিকা সঙ্গে থাকতো। পত্রিকায় ছেপে কবিতা বেরোয়, সে যে কী একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, সেটা বুঝতে পারতাম আমি। আর আমার কিছু বন্ধুবান্ধব। প্রতিভা কাকে বলে, সে বিষয়ে শহরের গণ্যমান্য শিক্ষিত ভদ্রজনেরা আদৌ কিছু বুঝতেন বলে মনে হতো না। আমাদের কাছে যা ছিল স্বপ্ন, তাঁদের কাছে সে সব ছিল

একরকমের বখাটেপনা। তবে সারদাচরণ কাব্যরত্ন মানুষটি ছিলেন অমায়িক আর সদাশয়। দেব-দ্বিজে ভক্তি তো ছিলই। শহরের গণ্যমান্য সবাইকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর কথাবার্তা আচরণ ছিল অত্যন্ত ভদ্র। সেইজন্য সকলেই তাঁর সঙ্গে হেসে কথা বলতেন। বড়োদের চালে একটা মুরুব্বিয়ানা থাকলেও, একধরনের করুণামিশ্রিত স্নেহ করতেন। এমন কি কেউ কেউ, তাঁদের হাতের ছড়ি দুলিয়ে জিজ্ঞেসও করতেন, 'তা সারদা, তোমার কাব্যচর্চা কেমন চলছে?'

কাব্যরত্ন অত্যন্ত লজ্জিত আর বিনীত হেসে জবাব দিতেন, 'আপনাদের দয়ায় ভালোই চলছে। বুঝতেই পারেন, চর্চাটাই তো সব নয়, আসলে ধ্যান। ধ্যানের মধ্যেই তিনি জন্ম নেন। আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই এ কথাটা বুঝতে পারেন না। অথচ দেখুন, বিশাল হিমালয়ের মতো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন আমাদের সামনে। তিনি তো শুধু কবি নন, তিনি ঋষি। তিনি ধ্যানী। হিমালয়ের কতো গিরিগুহায় কতো রকমের আশ্চর্য জিনিস আছে। সে সব তিনি দেখতে পান। আমরা পাই না। অতএব, তিনি যা লেখেন, আমরা তা সব বুঝতে পারি না। আধুনিক কবিরা তাঁকেও ছাড়িয়ে যেতে চায়। কী সব হাস্যকর কবিতা যে লেখে, পড়লে তার মাথা মুণ্ডু পাওয়া যায় না। আপনাদের দয়ায়, আমি ওসব মাথামুণ্ডুহীন কবিতা লিখি না। এই সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রিকায় আমার একটা কবিতা বেরিয়েছে। পড়ে দেখবেন।'

সারদাচরণ কাব্যরত্ন এইরকম ভাবে বলতেন। যাঁদের বলতেন, তাঁরা যে আদৌ কারোর কবিতা নিয়েই ভাবতেন বা পড়তেন, তা নয়। বরং এমনও শুনেছি, রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা বিদ্রূপ করতেন। কারণ, তিনি নাকি ইংরেজির নকল করতেন। নজরুলকে যা বলতেন, তা লেখা যায় না। কবিদের নামই তাঁরা জানতেন না। যেটুকু জানতেন, সবই শনিবারের চিঠি-র সমালোচনা মারফৎ। আসলে, তাঁরা অফিসের সাহেব, তাঁদের কীর্তিকাহিনী, এবং সহকর্মীদের নানা সমালোচনা নিয়েই মুখরোচক আলোচনা করতে ভালোবাসতেন। নিতান্ত যাঁরা কিছু কবিতা গান নিয়ে উৎসাহী ছিলেন, ডি. এল. রায় ছিলেন তাঁদের কাছে আদর্শ।

কবি ডি. এল. রায় অবিশ্যি সারদাচরণ কাব্যরত্নের কাছেও একজন আদর্শ কবি ছিলেন। কারণ, তিনি তাঁকে বুঝতে পারতেন।

যাই হোক, আমরা এটা বুঝেছিলাম, সারদাচরণ একজন প্রতিভাবান কবি।

তা না হলে পত্রিকার সম্পাদকেরা তাঁর কবিতা ছাপতেন না। আর কাব্যরত্ন উপাধিটিও তিনি স্থানীয় সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছ থেকে পেতেন না। এবং স্থানীয় পণ্ডিতরা এই উপাধিটি তাঁকে দিয়েছেন সাহিত্য পরিষদ থেকে।

আমার হাতে লেখা পত্রিকা দেখে, তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেটা আমার একটা মস্ত গর্বের কথা। পত্রিকার সৌষ্ঠব দেখে তিনি মুগ্ধ। বলেই ফেলেছিলেন, 'আহা, এমন একটি পত্রিকা বের করলে, আমার একটা কবিতা দিলে না কেন?'

সে-সাহস আমার ছিলই না, হাতে লেখা পত্রিকার জন্য তাঁর কবিতা চাইবো। যাঁর কবিতা ছেপে বেরোয়, তিনি কবিতা দেবেন সামান্য একটা হাতে লেখা পত্রিকায়! বেশ মনে আছে, আমার আশঙ্কার কথা শুনে, মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বলেছিলেন, 'পাগল ছেলে। কবিতার আসল জন্ম তো হাতে লিখেই। মহাভারত রামায়ণ কি ছাপা হয়েছিল? লোকে হাতে লিখে ঘরে রেখে দিত। ছাপাখানা হয়েছে বলেই না, এখন সব ছাপার রেওয়াজ হয়েছে। ছাপা পত্রিকা থেকে হাতে লেখা পত্রিকা মোটেই ছোট নয়। আমি তোমাকে পরের সংখ্যার জন্য একটা কবিতা দেবো।'

খুবই সম্মানিত আর আপ্লুত বোধ করেছিলাম। এবং বলতে গেলে, সারদা-চরণ কাব্যরত্নের কবিতার জন্যই, আমাদের পরবর্তী পত্রিকাটি তাড়াতাড়ি বের করেছিলাম। সচরাচর ছাপানো পত্রিকায় তাঁর ছোটো কবিতাই বেরোতো। কিন্তু তিনি আমাদের একটি দশ পাতার কবিতা দিয়েছিলেন। কবিতাটি ছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দের। অনেকটা মেঘনাদবধ কাব্যের ধাঁচের। বিষয় ছিল, যুদ্ধে যাবার আগে উত্তরার কাছ ছেকে অভিমন্যুর বিদায় গ্রহণ। শহরের রেললাইন পেরিয়ে, ধূ ধূ মাঠে, এক বিকালে, তিনি উদাত্ত স্বরে সেই কবিতা নিজে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। পড়তে পড়তে তিনি নিজে তো কেঁদেইছিলেন। আমিও চোখের জল সংবরণ করতে পারিনি। সেইদিন তিনি একটি কথা বলেছিলেন, 'প্রেমই হচ্ছে আদি কবিতা। তা তুমি সে-প্রেম ঈশ্বরেই অর্পণ কর, আর প্রেমিকাকেই উদ্দেশ্য করে লেখ। যার প্রাণে প্রেম নেই, সে কখনো কবিতা লিখতে পারে না।'

এতোটা আমার হজম হবার কথা নয়। অকালপক্কতার সেটাও একটা কারণ। যাই হোক, তাঁর সেই দশ পাতার কবিতার সঙ্গে, আমি অনেক ছবিও এঁকে-ছিলাম। তার মধ্যে একটা ছবি ছিল, 'তবে দেহ আলিঙ্গন ওগো উত্তরে! শত্রু-পাশে যাত্রা কালে, শেষ চুম্বন মাগি তোমা কাছে।' ছবিটা যখন দাদার চোখে

পড়েছিল, বউদিকে ডেকে দেখিয়েছিলেন। বউদি বলেছিলেন, 'চমৎকার!' দাদা বলেছিলেন, 'ছবি আঁকার নিকুচি করেছে। পাকামির একটা সীমা আছে। নাক টিপলে দুধ বেরোয়, সে আঁকবে এ সব ছবি?' বলেই কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন।

সে-সব আমার দুঃখের কথা। এখানে আর তা ব্যক্ত করতে চাই না। ছবিটা আবার এঁকেছিলাম। কবি সারদাচরণ সেই ছবিটির দিকে তাকিয়ে, ঝাড়া আধঘণ্টা একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমার কবিতার থেকে তোমার ছবি অনেক সুন্দর হয়েছে। আমি যা লিখতে চেয়েছি, তুমি তাকে আরো সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছ। আমার ভেতরের প্রেম তোমার ছবিতে ফুটে উঠেছে।'

এই ঘটনার পরেই, কোনো জেলা শহরের একটা দু পাতার ছাপানো পত্রিকায়, আমাদের হাতে লেখা পত্রিকার দু লাইন প্রশংসা বেরিয়েছিল। সেই সঙ্গে আমার নাম করে ছবির প্রশংসা। ছাপার অক্ষরে সেই প্রথম আমার নাম বেরিয়েছিল। কী যে উত্তেজনা, আজ আর তা বোঝাবার ভাষা আমার নেই।

আমাদের হাতে লেখা পত্রিকার আয়ু বেশিদিন ছিল না। তিনটি কি চারটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। অভিভাবকরা যথেষ্ট প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে ভেবে, ওসব একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সারদাচরণ কাব্যরত্নের একটি কবিতার বই বেরিয়েছিল। নীল রঙের পাতলা মলাট। সাকুল্যে গোটা পঁচিশ কবিতা। পাতা সংখ্যা বত্রিশ। তিনি নিজে খরচ করেই প্রকাশ করেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, কবিতার বইটি প্রকাশ করার জন্য, এক মাসের সংসার খরচ দিতে পারেননি। তার ফলে, তাঁকে তাঁর বাবা দাদার কাছে খুবই অপমানিত হতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি আমাকে হেসে বলেছিলেন, 'বাবা দাদার দোষ দিই না। তাঁরা কবিতা বোঝেন না। একমাসের খরচা না দেওয়াটা সাংঘাতিক ব্যাপার। মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে, একটা লোক বিনি পয়সায় দুবেলা খাবে, এটা চলে না। তবে, আমি অপমান গায়ে মাখিনি। কারণ খেয়ে বেঁচে থাকা এক কথা। কবিতা লিখে বেঁচে থাকা আর এক কথা। বাবা দাদা আজ বুঝবেন না, একদিন বুঝবেন। সেদিন হয় তো আমি বেঁচে থাকবো না, কিন্তু 'অন্তর্যামী' নিয়ে তাঁরা গর্ব করবেন।'

তাঁর কবিতার বইটির নাম দেওয়া হয়েছিল, 'অন্তর্যামী'। একটি বই আমাকে

দিয়েছিলেন। লিখে দিয়েছিলেন, 'সকল মানুষের মধ্যে কবি বাস করেন। যিনি লিখতে পারেন, তিনি পূর্ণ মানব হয়েন।'

কথাটা তাঁর নিজের কী না, অথবা নিজের থেকে ভেবে লিখেছিলেন কী না, জানি না। তবে কথাটা কেন যেন আজও ভুলতে পারিনি। তারপরে তিনি সলজ্জ হেসে আমাকে বলেছিলেন, 'তোমাকে তো মণিকাদেবী খুবই স্নেহ করেন।'

মণিকাদি ছিলেন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের হেড মিস্ট্রেস। বিধবা হলেও, তিনি রঙীন শাড়ি জামা পরতেন। দেখতেও বেশ সুন্দরী ছিলেন। বয়সও খুব বেশি ছিল না। বলেছিলাম, 'আমাকে প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতে বলেন। অনেক গল্প করেন।'

সারদাচরণ কাব্যরত্ন সলজ্জ হেসে বলেছিলেন, 'তাঁকে আমার কবিতার বই একটি পাঠাতে চাই। তুমি দিয়ে আসবে?'

আমি আপত্তির কোনো কারণ দেখিনি। বলেছিলাম, 'দিন।'

কাব্যরত্ন বইটিতে মণিকাদির নাম লিখে, নিচে লিখে দিয়েছিলেন, 'অন্তর্যামী'-কে আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম। ইতি, দীন-কবি সারদাচরণ পাল কাব্যরত্ন।

মণিকাদি বইটা দেখে হেসে বাঁচেননি। সে হাসির কী রহস্য সম্যক বুঝতে পারিনি। বইটি কীভাবে দেওয়া হয়েছিল, দু একটি কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারপরে একগাদা কাগজপত্রের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। কাব্যরত্ন আমাকে বিশেষ ব্যগ্র ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মণিকাদি কবিতার বইটি পেয়ে কী বলেছেন।

সংসার বোধহয় এমনি করেই মানুষকে তার নিজের মতো ক'রে তৈরি করে। আমি বলেছিলাম, 'মণিকাদি বইটি পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। বললেন, সারদা-বাবু খুব ভালো কবিতা লেখেন।'

কাব্যরত্নের সেই স্বপ্নমুগ্ধ অন্যমনস্ক মুখের ছবিটি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। পরে মণিকাদির মুখে শুনেছিলাম, কবি তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। বলতে বলতে মণিকাদির সে কি হাসি! মনে হয়েছিল, দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন। আমাকে চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি আজকাল খুব দুষ্টু হয়েছ। কেন ওকে বলতে গেছ, আমি ওর কবিতা পড়ে খুব খুশি হয়েছি? যতো সব পাগলের কাণ্ডকারখানা।'

মণিকাদির কথা, হাসি, যে একেবারে বুঝতে পারিনি, তা নয়। ইতিমধ্যে

কয়েকটি বছর কেটেছিল। কৈশোরের বিস্ময় ও মুগ্ধতা ফ্যাকাশে হতে আরম্ভ করেছিল। সারদাচরণ কাব্যরত্নের যুগ যে আমার কৈশোরের অনেক আগেই অতীত হয়েছিল, সেটা বোঝবার মতো অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কিন্তু কেমন করে যেন, তিনি আমার মনে একটা স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন। ছাপার অক্ষরের কবি, আর কেবল 'কবি' বিস্ময় নিয়ে ছিলেন না। আমার ছেলেবেলায় তিনি একজন প্রত্যক্ষ কবি ছিলেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিতে কবি শিল্পীর যে কোনো বয়স নেই, তাঁর স্নেহের আশ্রয় এবং আত্মীয়তা সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল।

মণিকাদি কবির চিঠির কোনো জবাব দেননি। তিনি আমাকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছেন, মণিকাদি আমাকে তাঁর কথা কিছু বলেছেন কী না। বলা বাহুল্য, আমি বলতাম, না। কিছুই বলেননি। শুনে তাঁর মুখে একটি বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠতো। কেবল একদিন বলেছিলেন, 'আসলে মণিকাদেবী নিজেই তো একটি কবিতা। তিনি আর কবিতার কথা কী বলবেন।'

এই কথাটিও আমি কোনোদিন ভুলতে পারিনি। কবিতার বই প্রকাশের কিছুকালের মধ্যেই সারদাচরণ কাব্যরত্ন বিয়ে করেছিলেন। নিমন্ত্রণ পাইনি। আসলে জানতেই পারিনি। একদিন সিনেমা দেখতে গিয়ে, তাঁকে সস্ত্রীক দেখেছিলাম। কবির ধুতি পাঞ্জাবিতে সেদিন ছিল বেশ শৌখীন চাকচিক্যের ছাপ। চশমা জোড়া ঝকঝকে। পান খেয়ে ঠোঁট লাল। পার্শ্ববর্তিনী কবিপত্নীর খাস্তা সিল্কের শাড়ির ঘোমটা ছিল বড় বেশি টানা। কলাবউটির কালো মুখটি ভালো করে দেখতে পাইনি। খাটো এবং স্বাস্থ্যের বহরটি চোখে পড়বার মতো ছিল। আলতা পরা পায়ে ছিল চীনেবাজারের স্যাণ্ডেল। কবি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। উভয়কেই প্রণাম করেছিলাম। কবি জনান্তিকে বলেছিলেন, 'আসল গাঁটছড়াটা তো কবিতার সঙ্গেই বাঁধা হয়ে গেছে, কারণ আমি একজন কবি। কিন্তু সংসার এসব বুঝতে চায় না। বাবা মা'র কথা রাখতে এ কাজটা করতে হয়েছে। তবে একটা কথা হলো, নারী প্রেরণা যোগায়। তাই বিয়ের উপলক্ষে একটা বড়ো কবিতা লিখেছি। সেটা তোমাকে একদিন পড়ে শোনাবো।'

সে-কবিতা আর শোনা হয়নি। জীবনের টানে আমিই অন্যদিকে ভেসে গিয়েছিলাম। রবীন্দ্রোত্তরকালের বেশ কয়েকজন কবির কবিতা তখন আমার সামনে কাব্যজগতের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছে। সারদাচরণ পাল কাব্যরত্নের কবিতা কোনো কাগজেই চোখে পড়তো না। বস্তুত কবি হিসাবে তাঁকে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। জীবনটা তো এইরকমই।

বেশ কয়েক বছর বাদে, একদিন ট্রেনে করে কলকাতা থেকে ফিরছিলাম। লোকাল ট্রেন। অসম্ভব ভিড়। মানুষে মালপত্রে ঠাসাঠাসি। তার মধ্যে জায়গা আর মাল রাখা নিয়ে যাত্রীদের ঝগড়া বিবাদ। একজন যাত্রী তার মাল রাখবার জন্য আর একজনের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া লাগিয়েছে। তার মধ্যে একজনের দিকে তাকিয়ে আমি প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিলাম। কবি সারদাচরণ কাব্যরত্ন! গায়ে একটা ময়লা জামা। ঘামে ভেজা, বুকের বোতাম খোলা। ময়লা ধুতিটা হাঁটুর কাছে তোলা। মুখে কয়েকদিনের না-কামানো গোঁফ দাড়ি।

বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না। গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে সকলেই একটু থিতু হয়ে বসেছিল। কবির সঙ্গে আমার মুখোমুখি হয়েছিল। তিনি আমাকে দেখেই দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন, 'আরে তুমি? তোমাকে বহুদিন দেখিনি।'

বলেছিলাম, 'আমি আজকাল অন্য জায়গায় থাকি। কিন্তু আপনি এসব মালপত্র নিয়ে কী ব্যাপার?'

কবি বিব্রত করুণ হেসে বলেছিলেন, 'আর বল কেন? ইস্কুলে নতুন হেডমাস্টার এসে, প্রথমেই আমাকে বিল্বপত্র শুঁকিয়ে দিলেন। আমার নাকি প্রাইমারি সেক্শনে পড়াবার মতো কোয়ালিফিকেশনও নেই। লড়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তুমি জানো, আই এ্যাম এ পিস্ লাভিং ম্যান। আই এ্যাম এ পোয়েট। বাবা বসিয়ে দিলেন আমাদের দশকর্মা ভাণ্ডারের দোকানে। এখন দোকানে বসছি। মাঝে মধ্যে কলকাতায় বড়বাজারে মালপত্র কিনতে আসতে হয়। তবে বোঝই তো, কবিতা হচ্ছে পরশ পাথর। একবার যাকে ছুঁয়েছে, তার আর উপায় নেই। আজকাল সময় বিশেষ পাই না। একঘর ছেলেমেয়ে, জায়গাও নেই। সপ্তাহে একদিন কবিতা লিখি, ছাদের এককোণে বসে। অনেক জমে গেছে। ভাবছি দুটো বই ছাপবো। টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারছি না। চেষ্টায় আছি।

কথাটা বলবো না ভেবেছিলাম। কিন্তু না জিজ্ঞেস করে পারিনি, 'আজকাল পত্রিকায় আপনার কবিতা দেখতে পাই না।'

কবি হেসেছিলেন। বয়সটা বেড়েছিল। সামনের পাটির কয়েকটা দাঁত অকালেই ঝরে গিয়েছিল। চোখের সেই শৌখীন চশমার বদলে তখন মোটা লেন্সের চশমা। বলেছিলেন, 'কী করে দেখতে পাবে? ছাপেই না তো। সম্পাদকরা সব বদলে গেছেন। নতুন সব কবিরা এসেছেন। কী যে ছাইভস্ম লেখে, কিছুই বুঝতে পারি না। সম্পাদকরাই বোঝেন, আর কবিরাই বোঝেন। আমি এখন অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেছি। তা হোক, কবিতা আমি লিখি। এই দেখ না—।'

পকেট থেকে বের করেছিলেন একটা ময়লা তেলচিটে খাতা। যার পাতা ভরতি হিসাবপত্র লেখা। তার মধ্যেই, কোনো কোনো পাতায় কবিতা লেখা। বলেছিলেন, 'বড়বাজারের গদীতে বসেও হঠাৎ কবিতা মাথায় এসে যায়। তুমি না থাকলে এখন ট্রেনে বসেও লিখতাম। গদীতে প্রায়ই বসে থাকতে হয়। কেউ বাধা দেবার নেই। ট্রেনেও তাই। দোকানে আর বাড়িতে হয় না। কিন্তু কবির ভাবের জগৎ তো থেমে থাকে না। সে মনে মনে নিরন্তর রচনা করে চলেছে। তার কারণ কী? কারণ কবির মধ্যেই মানুষের পূর্ণ সত্তা বিরাজ করছে।'...

কবিই যে পূর্ণ মানব, এ কথাটা তিনি আগেও বলেছেন। ঠিক কোন্ অনুভূতি থেকে এ কথাটা তিনি বলতেন, আমি কোনোদিন বুঝতে পারিনি।

কয়েক বছর পরে, তাঁকে একদিন শেষ দেখেছিলাম। চেহারায় বার্ধক্য নেমে এসেছে। কিন্তু চোখে সেই স্বপ্নাচ্ছন্নতা। চিরকালের মতোই শান্ত, অমায়িক, ভদ্র। দেখেছিলাম, আমাদের শহরের রেলওয়ে ইস্টিশনে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল একদল তরুণ কবি। তরতাজা সব ছেলে, চোখে মুখে কাব্যের আগুন। সারদাচরণ কাব্যরত্নকে ঘিরে তারা কী সব জিজ্ঞেস করছিল। সকলের মুখেই বিদ্রূপের হাসি।

আমি পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম। একজন তরুণ কবি তার ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে বেশ গোঁয়ারের মতো জিজ্ঞেস করছিল, 'আপনি বলুন, বলতে হবে, কেন আপনি কবিতা লেখেন? ওসব নেতিবাচক জবাব শুনতে চাই না।'

কবি মাথা বাঁকিয়ে হেসে বলেছিলেন, 'বললাম তো ভাই, এর থেকে আর সোজা কথা কী হতে পারে? ভালোবাসি।'

'ওসব ভালোবাসাবাসি দিয়ে কিছু বোঝা যায় না।' তরুণ কবি তেরিয়া হয়ে বলেছিল, 'কেন ভালোবাসেন। ভালোবাসলেই কবিতা লিখতে হবে?'

কবি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ। ভালোবাসা তো এমনি হয় না। ভালোবাসা যে কি বস্তু, তোমরা নিশ্চয়ই জান। ভালোবাসা থেকেই কবিতা আসে।'

'আমরা মশাই ভালোবাসা টাসা জানি না।'

'তা হ'লে তোমরা কবিতা লেখ কেমন করে? ভালোবাসা খুব কঠিন, কেবল বাসলে তো হয় না। পাওয়াও চাই। কবিতাও তোমাকে ভালোবাসবে, তবেই সে তোমার হাতে ধরা দেবে।'

"যত্‌তো সব বুজরুকি। শুনুন, ওসব ভাবালুতা দিয়ে কবিতা লেখা হয় না। নতুন কিছু জমা থাকে তো বলুন।'

সারদাচরণ কাব্যরত্ন হেসে বলেছিলেন, 'নতুন কথা তো কিছু জানি না বাবা। সার্থক কবি হলেন একজন পূর্ণ মানুষ। যেমন ভাবের মধ্য দিয়ে কবিতা আসে, তেমনি কবিতা একটু একটু করে একজনকে পূর্ণ করে তোলে। ভালোবাসা তো এটাই। তুমি আমি আমরা সবাই পূর্ণ হতে চাই। চাই না?'

'কাঁচকলা চাই। আপনি কবিতার কিস্যু বোঝেন না। পূর্ণতা টুর্ণতা সব ভেক্ কথা।'

সারদাচরণ কাব্যরত্ন তরুণ কবিদের মুখের দিকে তাকালেন। একটা নিশ্বাস ফেলে, ঘাড় কাত করে বললেন, 'তাই হবে হয়তো। তবে, তোমাদেরও কিন্তু একজন পূর্ণ কবি হতে হবে।'

তরুণ কবিরা হেসে টিটকারি দিয়ে নানা কথা বলছিল। সারদাচরণ হাতের মোটা লাঠিটা ঠুকে ঠুকে অন্যদিকে চলে গিয়েছিলেন। দেখেছিলাম একটু গ্লানির ছাপ নেই তাঁর মুখে। চোপসানো গালের ভাঙাচোরা ভাঁজে ভাঁজে হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর মুখে।

আর দেখা হবে না

বুলবুল বসু

পড়তে আমি খুব ভালবাসি। সারাদিনের হাজার কাজের মধ্যেও একটা সময় আছে, যখন আমি পড়ি। সে পড়াটা যে-কোন বিষয় হতে পারে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সবথেকে প্রিয়। যখন অন্য কোন বই বা পত্রিকা হাতের কাছে থাকে না, তখন রবীন্দ্রনাথেরই রচনা—যা হয়তো আগে আরও কয়েকবার পড়া হয়ে গেছে, সেগুলোই আবার পড়ি। আলোচনা করতেও খুব ভাল লাগে। কিন্তু লেখালেখির ব্যাপারে তেমন অভ্যস্ত নই। সেই আমি লিখবো, সে আবার এমন একজনের সম্বন্ধে, যিনি একাধারে, একজন বরেণ্য ও সমালোচিত সাহিত্যিক আর আমার প্রাণের প্রিয় বাবা। তিনি সমরেশ বসু। খুব স্বাভাবিকভাবেই সে লেখা হয়তো স্মৃতিচারণাই হবে তার বেশি কিছু নয়। এই ত 'বাবা' আর 'সমরেশ বসু' এই দুটি কথা সবে লিখেছি, আর আমার মনে অদ্ভুত একটা ভালবাসার অনুভূতি। আর একই সঙ্গে মনের মধ্যে এক হাহাকার—আর কোনও দিনও বাবাকে 'বাবা' বলে ডেকে সেই চিরপরিচিত উত্তর 'হুঁ বল্' শুনতে পাবোনা।

সাহিত্যিক সমরেশ বসুকে নিয়ে আলোচনা বা তাঁর সাহিত্যের বিচার করার মতো অনেক জ্ঞানীগুণীজন আছেন তাঁরা তা করবেন। আমি শুধু মানুষ সমরেশ বসুর একটা দিক নিয়ে একটু বলার চেষ্টা করবো। সাংসারিক জীবনে চলার পথে এবং সাহিত্যরচনায় সারা জীবন যে মানুষটি যোদ্ধার ভূমিকা নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন, সেই মানুষটিই, তাঁর সন্তানরা যাতে প্রত্যেকে সুস্থমনের একটি করে ভদ্র মানুষ তৈরি হয়ে উঠ্‌তে পারে, তার জন্যও তিনি সবসময় চিন্তা করতেন। প্রতিটি সন্তানের প্রতি তাঁর যে কী তীক্ষ্ণ লক্ষ্য ছিল, তা তখন অনুভব করিনি। যত বড় হয়েছি, মানে আমাদের বয়স যত বেড়েছে, ক্রমশ তা অনুভব করতে পেরেছি। ভাবতে খুব অবাক লাগে যে, ছেলেমেয়েদের ছোটখাটো কোন ব্যাপারই ওই ব্যস্ত মানুষের নজর এড়িয়ে যেত না, এবং তার জন্য যা ব্যবস্থা নেওয়ার, তা

[লেখিকা সমরেশ বসুর অতিপ্রিয় জ্যেষ্ঠ সন্তান। স্বনামধন্য রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী ও শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনের অধ্যাপিকা।]

সঙ্গে সঙ্গেই নিতেন। এমনকি জীবিত থাকার প্রায় আগে পর্যন্তও তা করে গেছেন।

যখন খুব ছোট ছিলাম, আমরা চার ভাইবোন বাবাকে বিশেষ কাছে পাইনি। সকালবেলা বাবা লিখতে বসতেন, এবং স্থানাভাবের জন্য মা আমাদের ভাই-বোনেদের ঘরের বাইরে খেলা করতে বলতেন। মায়ের এ কথা শুনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, এখন বাবা লিখছেন, তোমরা কেউ জোরে কথা বলবে না, যা করবে আস্তে। অবশ্য যেদিন আমাদের স্কুল থাকতো না, সেদিন।

বাবার সঙ্গে আমাদের একটা দূরত্ব ছিল, কিন্তু ওর মধ্যেই যেটুকু পেতাম—সেটুকুই অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। যত বড় হয়েছি ক্রমশ সেই দূরত্ব ঘুচেছে এবং বাবা আর শুধু বাবা থাকেননি কোন্ এক সময় আমরা যেন পরস্পর পরস্পরের বন্ধুও হয়ে উঠেছি। এটাও তৈরি করেছেন বাবাই।

আমরা তখন খুব ছোট। ছোট বোনটি এতই ছোট ছিল যে, সে অধিকাংশ সময় মায়ের কাছেই থাকতো। কিন্তু আমরা পরপর তিন ভাইবোন সবসময়ই প্রায় একসঙ্গে থাকতাম। আমাদের বয়েসের তফাতও একজনের থেকে আর একজনের খুব বেশি ছিল না। আমার ঠাকুরদাদার মাত্র কয়েকমাস আগে মৃত্যু হয়েছে, বাবার মাথার চুল এক-দেড় ইঞ্চি মতো লম্বা। ঠাকুরদাদা গড়গড়ায় লম্বা নল লাগিয়ে ইজিচেয়ারে বসে তামাক খেতেন। ঠাকুরদাদার মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি হিসেবে বাবা ওই গড়গড়াটা জ্যাঠার বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন এবং কোথা থেকে একটা ইজিচেয়ার জোগাড় করে ওই গড়গড়ায় লম্বা নল লাগিয়ে তামাক খাওয়া অভ্যাস করেন কিছুদিন। আমরা তিন ভাইবোন খুব কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করতাম, বাবা বিড়ি, সিগারেট ছেড়ে দিয়ে একটা লম্বা নল মুখে দিয়ে টানেন, ভুড়ুক ভুড়ুক আওয়াজ হয়, আর এদিকে মুখ দিয়ে ঠিক সিগারেট খাওয়ার মতনই ধোঁয়া বেরোয়। আমরা খেলার ফাঁকে ফাঁকে ওই আওয়াজ কানে গেলেই দৌড়ে বাবার লেখার ঘরের সামনে আসি আর বাবার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকি—বাবার মুখেও থাকে মজাদার মিচ্‌কে হাসি। এখানেই শেষ নয়। ক্রমশ ওই বস্তুটি আমাদের এমন আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠ্‌লো যে, সপ্তাহে যে তিনদিন বাবা কোলকাতা যেতেন, সেই তিনদিন দুপুরে মাকে লুকিয়ে আমরা তিনজন একজনের পর একজন ওই নল মুখে দিয়ে টানতাম আর খুব মজা পেতাম। অবশ্য তামাক বা আগুন কোনটাই তাতে থাকতো না। এ ঘটনা

যে, কোন্‌দিন বাবার দৃষ্টিগোচর হয়েছে আমরা কেউই জানতাম না। হয়তো মা বলে দিয়েছিলেন। একদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে বাবা আমাদের তিনজনকেই কাছে ডাকলেন, বললেন—"তিনজনে লাইন করে দাঁড়াও। প্রথমে বুলবুল এসো, ওই নলটা মুখে দিয়ে টান। আমি তো হতভম্ব! কিন্তু বাবার কথা অমান্য করার অবস্থা আমাদের কারুরই ছিল না। অগত্যা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে দিলাম নলে টান। ভয়ে বেশি জোরে টানতেও পারলাম না। এইভাবে পরপর তিনজনে মুখে নল লাগিয়ে টান দিলাম। আমাদের অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। পাশের দরজায় তাকিয়ে দেখি মায়ের দৃষ্টি বাবা এবং আমাদের ওপর—চোখে হাসি, মুখে আঁচল চাপা। বাবা আমাদের বললেন, তোমাদের যখন ইচ্ছে হবে আমার সামনেই ওটা মুখে দিতে পারো—লুকিয়ে করার দরকার নেই। বলা বাহুল্য, এরপর আমাদের আর কোনদিন ইচ্ছেই হয়নি ওই নল মুখে দিয়ে টানার। এইরকম ছিল বাবার শাসনপদ্ধতি। কখনোই ধমকে বা চেঁচিয়ে আমাদের শাসন করেননি। তবে বাবার রেগে যাওয়া চেহারাও দেখেছি—সে বড় সাংঘাতিক। ওই ছোটখাটো শরীর তখন যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ। চোখের দিকে তাকালে পুড়ে যাব—এমন মনে হত। খুব গুরুতর কারণ না ঘটলে এই রাগ দেখা যেত না।

আমি তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। একটি বেশ বড় মেয়েস্কুলে পড়ি। আমাদের প্রধানা শিক্ষিকা ছিলেন খুবই বিদুষী সুন্দরী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্না। একদিন আমার ক্লাসের একটি মেয়ে গল্পচ্ছলে আমার বাবার সম্বন্ধে একটি বাজে কথা আমাকে শুনিয়েছিল। আমি তো বাড়ি এসে মায়ের কাছে সেই কথা বলে তুমুল কান্নাকাটি জুড়ে দিলাম এবং বললাম কাল থেকে আমি আর ওই স্কুলে পড়তে যাবো না। আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলাম—যার ফল ওই কান্না। বাবাও বাড়ি ফিরে এসে সব শুনে এমন রেগে গেলেন যে, মনে হল ওই মেয়েটিকে এখন পেলে বাবা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। ওই মুহূর্তে বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে আমার স্কুলে। কিন্তু তখন ছুটি হয়ে যাওয়ায় প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে পাওয়া গেল না। পরের দিন বাবা নিজে হাতে ওঁকে একটি চিঠি লিখে আমার হাতে দিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। চিঠিতে কি লেখাছিল জানি না। বড়দিদি (তখন মেয়েদের স্কুলে হেডমিস্ট্রেসকে এই বলে ডাকা হত) আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে বললেন, বোসো।

প্রঃ তোমার নাম কি?

উঃ বুলবুল বসু

প্রঃ কোন্ ক্লাসে পড় ?

উঃ ক্লাস সেভেনে।

প্রঃ তোমার বাবা কোথায় চাকরী করেন ?

উঃ বাবা চাকরী করেন না। বই লেখেন।

প্রঃ সেকি ? কি বই লেখেন ?

উঃ গল্পের।

বাবার চিঠিটা খুলে আর একবার বাবার নামটা দেখে নিলেন। আমাকে চলে যেতে বললেন। মাঝখানের ঘটনা আর আমি জানি না (কয়েকদিন পরে দেখেছিলাম, ওই সুন্দরী বিদুষী মহিলা একদিন বিকেলে আমাদের ছোট্ট বাড়িতে। এরপর যতদিন ওই স্কুলে পড়েছি, ততদিন পর্যন্ত বড়দিদি এবং আমার মা বিশেষ অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিলেন পরস্পরের। আমি ওই স্কুল থেকে বেরিয়ে আসার কিছুদিন পরে উনিও অন্য কোন স্কুলে চলে যান। আমার মায়ের গানের এবং বাবার লেখার একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তিনি। এ ধরনের ঘটনার তো শেষ নেই—ছেলেরা যে সময়টা খেলাধুলো করে আর একটু পড়াশুনো করে সময় কাটায়, সেই বারো বছর বয়স থেকে চৌষট্টি পর্যন্ত এই মানুষটির জীবন কেটেছে একেবারে অন্যরকম ভাবে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর বহুবর্ণ ঘটনার মধ্যে দিয়ে। সুতরাং কত ঘটনা আর বলবো।

শেষ করবো একেবারে আমার নিজের কথা দিয়ে। অন্য ভাইবোনেদের কথা জানি না, কিন্তু আমার জীবনে এই মানুষটির প্রভাব এত গভীরভাবে পড়েছে যে, এ জীবনে এখনও পর্যন্ত আর কোন পুরুষকে ভালবাসতে পারিনি, শ্রদ্ধা করতে পারিনি, মুগ্ধ হতে পারিনি। একদিক থেকে এ যেমন সুখের, অন্যদিক থেকে তেমনই বেদনাদায়ক। কেমন করে আর কোন্‌দিন থেকে যে বাবা আমার জীবনের সর্বোত্তম পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন, তা জানি না। একদিক থেকে বাবার নিজস্ব বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং অন্যদিক থেকে বাবার প্রতি মায়ের বিচারহীন ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বোধ হয় অজান্তেই আমার মনকে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় মুগ্ধ করে রাখতো। আমি কোনদিনও বাবার সঙ্গে বেশি কথা বলিনি, কিন্তু বাবাকে ছেড়েও বেশিদিন থাকতে পারিনি। বাবা রয়েছেন, ইচ্ছে করলেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কোলকাতার সেই পরিচিত বাড়িতে গিয়ে বাবার হাসিমুখ দেখতে পাবো—এতেই ছিলাম অভ্যস্ত। আর বাবাকে সুস্থ দেখতে

পাওয়া, এ যে কি শান্তি। আর যদি দেখতাম, অসুস্থ, মনের মধ্যে যে কী এক আতঙ্ক গুমরে উঠ্‌তো, সেকথা কাউকে বোঝাতে পারবো না। তবুও তো বাবাকে দেখতে পেতাম ! সেদিন সারারাত বরফের ঘেরার মধ্যে, বরফের উঁচু স্ল্যাবের ওপর বাবার নিথর, নিস্পন্দ শরীরের দিকে তাকিয়ে কেবল একটা কথাই বুকের মধ্যে তোলপাড় করছিল—হাজার ইচ্ছে করলেও আর কোনদিনও ওই মুখ দেখতে পাবোনা, কোনদিনও না।

প্রণাম নাও, ইতি বাবলু

নবকুমার বসু

তোমার সঙ্গে আবার আমার একটা নতুন সম্পর্ক তৈরি হচ্ছিল। অনেকটাই হয়েছিল। বাকিটা হওয়ার ক্ষেত্র চমৎকার তৈরি ছিল। কিন্তু সময়ের অভাব ছিল তোমার আমার উভয়েরই নানাবিধ কারণে। তোমার কাজকর্মের দায় ব্যস্ততা জটিলতা সঙ্কট ইত্যাদির ধারা যেমন ছিল একধরনের, আমার কাজেরও ঝামেলা টেনশন ইত্যাদি আর এক ধরনের। নতুন সম্পর্কটা দানা বাঁধছিল এই কারণে যে, যেহেতু তুমি দায়িত্বের এবং কাজের মানুষ ছাড়াও অসাধারণ মানবিক বোধসম্পন্ন শিল্পী, সেইজন্য আমারও জীবিকার ঝঞ্ঝাটটা তুমি খুব ভাল বুঝে নিতে পারতে। তা সত্ত্বেও ছোটাছুটি করাটা যে কারণে আমার কাজেরই অঙ্গ, তাই তুমি আমায় ডাকার জন্য মুখের প্রথম শব্দটি খসাতেই আমি তোমার দুয়ারে হাজির হতাম। কিন্তু আমার তো তোমাকে ডাকতেই সঙ্কোচ। তোমার মন শরীর লেখার চাপ অন্যান্য দিনের ডাক এইসব কেমন আছে, না আছে—প্রাথমিক এ সমস্ত ভেবে নেওয়ার পর হয়তো আলতো একটা ফোন। সার্কাস রেঞ্জ-এ।

তোমার পরিচিত স্টাইল—ঠিক পূর্ণ তিনজোড়া রিং হওয়ার পর তুমি রিসিভার তোল। (তুলতে! হায়!) প্রথমে হ্যালো বলার সময় বুঝতে পারতাম—তুমি সদ্য গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে বেশ একটা গম্ভীর স্বরে খুব ফরম্যাল ভাবে ওটা উচ্চারণ করো।

পর মুহূর্তে আমার গলা বুঝতে পেরেই, তোমার কণ্ঠস্বর ব্যস্ত বিতর্কিত সমসাময়িক কালের সাংস্কৃতিক স্ট্যাটাস সিম্বল সমরেশ বসু থেকে পালটিয়ে একেবারে চলে আসে গৃহস্থ বাঙালি পরিবারের স্নেহসিক্ত মানুষে। চিরকালীন ছাপ দেওয়া তোমার প্রথম দু একটি বাক্য।

—অ্যাঁ হ্যাঁ, বল।

—লিখছিলে?

[নবকুমার বসু সমরেশ বসুর দ্বিতীয় পুত্র। অত্যন্ত-প্রতিশ্রুতিময় তরুণ গল্পকার। শল্যচিকিৎসক হিসাবেও স্বনামধন্য।]

—ওই। চলছে আর কি। ছাড়ান তো আর নেই। কোত্থেকে ফোন করছিস?

—বাড়ি থেকে। শরীর কী বলছে, সব ঠিক আছে?

তোমার হাসি শুনতে পেতাম ফোনে। মুখটা দেখতে পেতাম। হাসির শব্দ শুনে দিব্যি বুঝে নিই শ্বাস প্রশ্বাস কতখানি স্বাভাবিক।

—আছে তো এখনও ঠিকই। কখন যে গোলমাল করবে। তুই কেমন আছিস?

—ভালই আছি। ও বেলা কী করছো?

এই সময়টা তোমার উত্তর নানারকম হওয়ার সম্ভাবনা। ভাষা পরিষদে মিটিং কিংবা আজ তো বুধবার, বুধসন্ধ্যায় যাব একবার, অথবা প্রতুলবাবুর সঙ্গে (ডঃ প্রতুল গুপ্ত), কিংবা অমুকের তো আজ আসার কথা···ইত্যাদি। উত্তর শুনতে শুনতে আমি তোমার ব্যস্ততা আন্দাজ করি। তারপর কোনরকম সুযোগ আছে মনে করলেই হঠাৎ সংকোচ-টংকোচ কাটিয়ে—চলে এসো-না সন্ধেবেলা। টুনি-মাসীকে (ধরিত্রী বসু) বলে দাও, ওবেলা রান্না করতে হবে না। তোমরা এখানে খেয়ে ফিরবে। সুরিন্দর-ও।

—আহ্ ছা, দেখি। হাসির শব্দ।

এই দেখাটা পূর্ণতায় ঝলমল করে ওঠে তুমি এসে পড়লেই। নিচে নার্সিং হোমের মেয়েরা থেকে শুরু করে, আমাদের রুগীরা, তাদের ভিজিটরস্ সকলের মধ্যেই শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহলী চোখ দিয়ে দেখে নেওয়া আর ফিসফিসানির শুরু। আমি কানে আর নাকে তোমার উপস্থিতি টের পেয়েই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসি। এক পা এক পা করে তুমি উঠছো। আরিব্বাস, কী দেখাচ্ছো! ঠিক জানি, তুমি ওই পাজামা-পাঞ্জাবিটা পরে আসবে। পুজোয় দিয়েছিলাম। বেশ ভাল ফিট করেছে। আমার স্ট্যাটাসটা কী দাঁড়াত ভাবো! সান্ধ্য আড্ডায় বাড়িতে সমরেশ বসু। খুশি আনন্দ সুখ আমার সামান্য 'এসো' বলার সঙ্গে বাকীটা নিঃশব্দ কিরণে ছলকায় দু চোখে, গোপনে। ভরে যাই।

আবার কখনও তোমার ওই "আহ্ ছা দেখি" যেন একটা হাত তুলে অপেক্ষা করতে বলা। আসার ইচ্ছে থাকলেও পারছো না। এতো ডিমাণ্ড তোমার, মাঝপথেই মবড্। ঘর বার করছি আসবে বলে। চিতল মাছের মুঠিয়া বানানো রয়েছে, ভয়ে ভয়ে চিংড়ি মাছের একটু মালাইকারি, চিকেন-ভেজিটেবল, প্রায় লুচির মতন সাইজের গোটা কয়েক পাতলা রুটি, সরু চালের ঝরঝরে ভাত ও,

ঘরের তৈরি মিষ্টি কিংবা নারকেল নাড়ু এবং অবশ্যই সুগোত্রের কিঞ্চিৎ পানীয়ের বিশেষ আয়োজন। অথচ তুমি আসছো না। তোমাকে ঘিরে অনেক মানুষ, কাজের, ভালোবাসার, আদিখ্যেতার, ধান্দারও। অনেক সময় তুমি ছেড়ে আসতে পারো না। জানি তো।

সম্পর্কের নতুন আর এক পূর্ণতা তৈরি হতে হতেও দেখতে পাই—হাসিমুখে তোমার একটা হাত তোলা।

—দাঁড়া আসছি। কিছুতে ম্যানেজ করতে পারলে না।—ইচ্ছে থাকলেই কি আর পারি রে সব সময়!

নতুন একটা ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছিল তোমার সঙ্গে। শেষ হয় নি। আসবে বলে এলে না। বসিয়ে রেখে গেলে। আর এমনভাবেই বসিয়ে রেখে গেলে যে দায়টা এবার আমার ঘাড়েই এলো। আমাকেই তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে হবে। কিন্তু এবারের দেখা করতে যাওয়ার ব্যাপারটা অন্যরকম হবে। তোমার ডাক এবং আমার সংকোচ ছাড়া হিসেব নিকেশের বাইরে গিয়ে। তবু আমাকে যেতেই হবে। রবীন্দ্রনাথের গানের একটা লাইন মনে আসছে। —কবে তুমি আসবে বলে, রইবো না ব'সে আমি চলবো। চলবো বাহিরে।

বাইরে তো চলতেই হবে। এবং একা একা। তুমি ট্রেনিং দিয়েছিলে সেইরকম ভাবেই। আঁচলে জড়িয়ে আতুপুতু করে রাখার ধার কাছ দিয়ে যাও নি কখনও। আমিও তৈরি হয়ে গেছি তেমন ভাবেই। গড়ে পিটে ঠেলেঠুলে খানিকটা বানিয়ে দেওয়ার পর, তোমার ভাষায় গোড়াটা একটু শক্ত হলেই—তুমি ছেড়ে দিয়েছ। আমি একা একা চলে গেছি। তোমার পরিচয়ে কোথাও যাই না, কিন্তু মুখমণ্ডলের কোথাও এমন কিছু ছাপ রয়েছে—যার জন্য ধরে ফেলে অনেকেই। কেউ বলে, কেউ বলে না।

কিন্তু এভাবে মহীরুহসম বৃক্ষের পাশে তৃণসম চারাগাছের সত্য অথচ কুণ্ঠিত পরিচিতি সবসময় সুখকর তা অবশ্যই নয়। দ'লে পিষে আহত হতে হয়েছে অনেক সময়। তুমি তা জানতে খুব ভালরকম। আর তোমার এই জানা অনুভূতিটাই বড় মানসিক সমর্থন। খুব শালীন অবজ্ঞা দিয়ে বৃথা কত লোক দূরে হটিয়ে দিয়েছে। দেয়। মানুষ বলে ভাবে নি, আমার আলাদা মানুষ হিসাবে প্রাপ্যটুকু দেয় নি। আমার কায়াকে কত সময় কতজন তোমার ছায়া ধরে নিয়ে ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। কী কাণ্ড! আত্মার আত্মীয়দের শাসনে কখনও তুমিই বাধার ব্যূহ হয়ে দাঁড়িয়েছ—এভাবেও সত্যি বলা যায়।

একবার বলেছিলাম বলে তোমার কি হাসি! হো হো হো। রাত্তির বেলা। তারপর কী বললে!

—সররেশ বসুর নাম এখন তো আর হরিপদ কিংবা দোলগোবিন্দ হতে পারে না। মনে হচ্ছে ডাক্তারবাবুর মন-মেজাজটা খুব···কিছু আঁতে লেগেছে। ওরে মুখ্যু আয়, এদিকে আয়—একটু আদর করি।

এই হচ্ছে ঠিক আসল জায়গাটা। যেখানে যত ক্ষোভ কষ্ট দুঃখ জমতো—তোমার ভূমিকা হচ্ছে ঠিক সেই জায়গাটি শেষ পর্যন্ত স্পর্শ করা। আর মনের দগদগে ক্ষতটার ওপর, আন্তরিক অনুভূতির ছোঁয়াটা লাগলেই তো প্রকৃতপক্ষে এক রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। ধুয়ে যায় সব কিছু। ধুইয়ে দিতে তুমিই। আর সেখানটাই এক বড় ধরনের শূন্যতা রেখে আসি আসি করেও কেমন এক অসম্পূর্ণতায় রয়ে গেল ব্যাপারটা।

কি বিশেষ অভিমান তোমার ছিল জানি না। তবে নানাধরনের ক্ষোভ অভিমান তো অবশ্যই ছিল। শরীর-টরির তোমার যখন মাঝেমধ্যেই খারাপ যাচ্ছে, এমনসময় তুমি একদিন বললে—তুই কি ভাবছিস, সমরেশ বসু ম'রে গেলে সকলেই শুধু দুঃখ পাবে? কেউ কেউ খুশিও হবে না!

এ কথায় আমার বড্ড কষ্ট হয়েছিল। কিছু বলিনি। কষ্টের অনুভূতি ভিতরে জমিয়ে রেখে, মুখাবয়বে স্বাভাবিকতা বজায় রাখার কঠিন প্রক্রিয়া একটু একটু করে অভ্যাস করেছি। তোমার কাছ থেকেই শিখেছি। কিন্তু তোমার ওই কথা শোনার পর বুঝতে পারতাম—তোমার আশেপাশে এরকম মানুষজনও আছে যারা তোমায় পছন্দ করে না, কিন্তু তুমি তাদের ভালভাবেই চেন। সত্যি বলতে কি, আপাতত তোমার অনুপস্থিতিতে সেরকম দু একজন যে চোখে পড়ছে না এমন না। কিন্তু তাদের সম্পর্কে নির্বিকার থাকাই উচিত নিশ্চয়ই। তুমি তো প্রায়ই বলতে দুটো কথা। এক নম্বর হচ্ছে—দুমদাম রিয়্যাক্ট করে ফেলাটা কোনো কাজের কথা নয়। দু নম্বর যে-কোন ব্যাপারেই খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলিস না।

আমার সঙ্গে ইদানীং তোমার বেশ এইধরনের কথাবার্তা হত। তোমার মাথা নাড়া আর চোখের ভঙ্গি আর মুখের রেখার নড়াচড়া দেখে আমার বেশ তৃপ্তি হতো। প্রায় রামভক্ত হনুমানের মতন তোমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতাম—সমরেশ বসুর মতন এত বড় একটা মানুষ যখন আমার ভাবনাচিন্তার এইসব ব্যাপারগুলোকে সমর্থন করছে, তার মানে আমি ঠিক আছি, আমার জীবনযাপন

জীবন ধারণের লাইন ঠিক আছে। আমাকে তো কখনই তুমি বিশেষ পাত্তাটাত্তা দাওনি, তা সত্ত্বেও কি একটা ব্যাপার তোমার সঙ্গে আমার ক্রমশ গড়ে উঠেছিল—যার ফলে এই বছর তিনেক তুমি খুব চলে আসতে আমার কাছে। শেষে তো থেকেই গেলে। যাক্। তবে তোমার সঙ্গে শুধু যে প্রেম দিয়ে প্রেমের সম্পর্ক হয়েছে তা তো নয়। রীতিমত বিরোধিতার মধ্যে দিয়েও, কখনও মনে হয়েছে, সম্পর্ক এমন স্তরে পৌঁছেছে, যে সম্পর্ককে গুরু শিষ্যের সম্পর্কই বলা উচিত। এই প্রসঙ্গেই একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল—উনিশ শ' পঁয়ষট্টি কিংবা ছেষট্টি সালে আমি এমন একটা কাণ্ড করেছিলাম—কাণ্ডটা সেই ষোল সতেরো বছরের অপরিণত ইমোশন নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে প্রায় জেহাদ ঘোষণা—যার ফল আমি ধরে নিয়েছিলাম, আমি আমার পিতার ত্যাজ্যপুত্র হতে চলেছি এবং আমার মেডিকেল কলেজে পড়াটড়া সব চুকেবুকে গেল ইত্যাদি। কিন্তু তুমি ব্যাপারটা এমনভাবে ট্যাকল করেছিলে, যেটা আমার ভবিষ্যৎ জীবনের এক দারুণ টার্নিং পয়েন্ট এবং সারা জীবনের জন্য নিখুঁত শিক্ষা হয়ে রইলো।

ব্যাপারটা এইরকম—কাণ্ডটা ঘটে যাওয়ার পরের দিন সন্ধ্যাবেলা আমি যথারীতি কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেছি। গৌরী বসু সেই সময় অসুস্থ হয়ে ট্রপিকালে ভর্তি। আমার অবস্থা বলির পাঁঠার মতন করুণ এবং অসহায়। কেননা যে কাণ্ড গতদিন বাধিয়েছি—তার প্রতিক্রিয়া তখন আমার মধ্যে ক্রমশ সঞ্চারিত।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। ঝিরঝিরিয়ে বাতাস উঠেছে। উনিশ নম্বর ঋষি বঙ্কিম রোড, নৈহাটির বাড়িটায় নিথর নৈঃশব্দ চেপে বসেছে। তোমার লেখার ঘরে আলো জলছে। একতলায় প্রায় নিষ্প্রাণ জনা দু-তিন প্রাণী। আমার জিভে লোনা স্বাদ এবং গা গুলোচ্ছে। খাবারে বিন্দুমাত্র রুচি নেই। জীবনের ঠিকানা পালটে যাওয়ার প্রাক্ প্রস্তুতি এবং আশঙ্কা মাথায় ঘুরে চলেছে।

তোমার চটির শব্দ সিঁড়ি দিয়ে নামছে। খানিকটা নামার পর থেমে গেল। তোমার মোলায়েম কণ্ঠস্বর—শোন, খাওয়াদাওয়া সেরে একবার ওপরে আসিস তো। একটু কথা বলবো তোর সঙ্গে।

আমি ওপরে গেলাম। তুমি বললে—আয়। বোস।

আমি জানালার কোণায় মাথা নিচু করে বসে। তুমি পায়চারি করছো ঘরের মধ্যে। বোধহয় আমাকে একটু সময় দিলে পরিবেশে অভ্যস্ত এবং সাময়িক হতে। তারপর :

গতকাল সন্ধেবেলা তুই তোর দাদুর বাড়িতে গিয়ে যা করেছিস এবং যে

ভাষায় কথা বলেছিস, আমার মনে হয় এর কোনটাই তোর এতোদিনকার শিক্ষা এবং রুচির পরিচয় হয়নি। বাবা মা-এর জীবনে এমন অনেক ঘটনাই থাকে, ঘটে যা ছেলেমেয়েদের জানানো বোঝানো সম্ভব না। নিজের জীবন বয়স এবং অভিজ্ঞতাই শেষ পর্যন্ত এ সবের উত্তর দেয়। আর তুই যে সব ভাবনা মাথায় রেখেছিস যে—আর তোর পড়াশুনা হবে না, সব বন্ধ হয়ে গেল···ও সবগুলো মাথা থেকে একনম ঝেড়ে ফেল। মন দিয়ে পড়াশুনা কর, মাথা ঠাণ্ডা রাখ, শান্ত থাক। যা খেলতে চলে যা, কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে একটু আড্ডাটাড্ডা দিয়ে আয়।

উনিশ শ' বাহাত্তর সালের পর থেকে আমি আমার নিজের জীবন যাপনে অভ্যস্ত। ওই বছরই এম. বি. বি. এস. পাস করলাম—আর তারপর থেকেই তুমি আমায় আর ধরে রাখো নি। আমার ধারণা তুমি তোমার জটিল ব্যস্ত জীবন যাপনের মধ্যেও সম্ভবত খেয়াল রাখতে—গোড়াটা একটু শক্ত হওয়ার পরে যাকে তুমি বাড়তে দিলে একা একা, সেই গাছটা সরল সোজাভাবেই বাড়ছে কি না। বোধহয় ঠিকই ছিল। তোমার চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে আমি মাঝে-মাঝে দেখা হলে খেয়াল করতাম এক ধরনের তৃপ্তি। তোমার পরিচিত কারুর সঙ্গে তুমি আমায় এই বলে আলাপ করিয়ে দিতে—ইনি হচ্ছেন ডক্টর নবকুমার বসু।

আমার বিয়ের আগে, বটবৃক্ষের নিচে শিবলিঙ্গের সামনে ভক্তের গড় হয়ে প্রণাম করার মতন তোমায় যখন সব বললাম—তুমি উত্তরে আমায় বললে—শোন আমি তো জানি সবই। তোর কাছ থেকে আলাদা করে আমার একটি কথাই জানার আছে। মেয়েটির সঙ্গে এতোদিন আলাপ পরিচয় মেলামেশায় তোর কি নিজের থেকে মনে হয়েছে—এর সঙ্গে একসঙ্গে জীবনযাপন করতে পারবি!

—এখনও পর্যন্ত তো মনে হচ্ছে, হ্যাঁ পারবো।

—ব্যাস, তাহলে ঠিক আছে। আর কিছু বলবি?

—হ্যাঁ। আমার তো মাইনে এখন বিরানব্বই টাকা আট আনা। দুজনের মিলে···। আমার বিয়েতে লোকজন নেমন্তন্ন প্যাণ্ডেল ইত্যাদি খরচপত্র হোক আমি চাই না। আমার সে ক্ষমতাও নেই। তুমিও···

—ও ব্যাপারটা তুই আমার ওপর ছেড়ে দে। তুই যা বললি আমার তো জানা রইলো। একটা ছেলের বিয়েতে বাড়িতে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়ন করা ইত্যাদির মধ্যে একধরনের স্যাটিসফ্যাকশন আছে। সেটা আমি যা বুঝবো···।

তারপর সেই বাহাত্তর থেকে অষ্টাশি মাসের হিসেবগুলো বাদ দিয়ে পনেরো বছরের মধ্যে, শেষের দিকে বছর তিনেক ছাড়া, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এক

আলো-আঁধারি টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। আঁধারের আধিক্য অবশ্যই বেশি ; কেননা সেই যে তুমি একবার দিল্লি থেকে আমাকে এক অসাধারণ চিঠি লিখেছিলে—যার মধ্যে একটা কথা ছিল "অভিভাবকদের এক ধরনের আদরামির দৌরাত্ম্যে, ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত বয়সে পৌঁছেও নিজেদের ঠিক সুরক্ষিত করতে পারে না"—এইটা মেনে নিয়ে, আমি উপযুক্ত বয়সে পৌঁছেছি ধরে নিয়ে—তোমার কাছ থেকে আর কোনোরকম অবলম্বন এবং সমর্থন চাইনি। তার সঙ্গে এটাও ঠিক—আমার ক্ষেত্রে আমার অভিভাবকদের আদরামির দৌরাত্ম্যেরও কোনো প্রশ্ন ছিল না। আবার এটাও ঠিক—সেইসময় সদ্য সদ্য নিজস্ব জীবনযাপনের ধারা-বাহিকতায় প্রবেশ করে, আমার অসম্ভব প্রয়োজন হয়েছিল একটা প্রত্যক্ষ আশ্রয়ের। আমি জানি সে আশ্রয়ও আমার ছিল। কিন্তু ততদিনে আমি তো আশ্রয়দাতাকেও বুঝতে শিখেছি—সংগ্রামের বদলে করুণা ভিক্ষাকে যিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন।

তোমার সঙ্গে তখন আমার মাঝে মধ্যে দেখা হ'তো। আমি জানতাম, বুঝতেও পারতাম—সেই সময় তোমার নিজের জীবনও অসম্ভব জটিল এবং দুরন্ত গতিতে কেবল ছুটছে আর বাঁক নিচ্ছে। আমাকে দেখলেই বলো—তোর চেহারাটা এরকম হয়েছে কেন, খাটাখাটনি বেশি করছিস ? হাউস সার্জেনদের তো সারাক্ষণই দৌড়ঝাঁপ, খাওয়া-দাওয়া করিস ঠিকমতো ইত্যাদি। আমি আর কী বলবো ! সবই ভালো বলতাম। তা সত্ত্বেও অনুভব করতাম তোমার একস্-রে আই আমার ভিতরটা নিখুঁত দেখে নিচ্ছে। আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার মতন ওইটুকু অনুভবেই বেশ ঝরঝরে হয়ে হাসপাতালের ডেরায় ফিরতাম। বলতাম, চলি। তুমি বলতে—আয়।

ব্যাস, এইটুকুই।

কিন্তু আমার হিসেব নিকেশের সব ব্যাপারগুলোই আবার নতুন করে তুমি নাড়িয়ে দিয়ে গেলে এই বছর তিনেকে। নতুন এক সম্পর্কের বাঁধনে জড়ালে। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী আমাদের জীবিকা হওয়া সত্ত্বেও, নতুন এক ধরনের বন্ধুত্বে তুমি আমায় স্পর্শ করলে। আমার কিঞ্চিৎ সাহিত্যপ্রীতির কারণে বাংলা হাতের লেখা প্র্যাকটিস করি—সম্ভবত এই ব্যাপারটা তোমায় আনন্দিত করতো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কিছু ইশারা ইঙ্গিত সম্ভবত নির্দেশও তুমি মণিমুক্তোর মতন রেখে গেছ। আমি কি তার কিছু কিছু কুড়িয়ে নিতে পারবো ! আশীর্বাদ করো যেন পারি। প্রণাম নাও।

আমাদের তরবরি

চুনীলাল দত্ত

কিছুদিন হ'লো আয়কর অফিসার হিসাবে দার্জিলিং-এ বদলি হয়ে এসেছি। সহরের পথঘাটের সঙ্গে তখনও সম্যক পরিচয় হয়নি। বাঙালি মহলে জোর আলোচনা—সাহিত্যিক সমরেশ বসু এক বন্ধু নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছেন। কথাটা কানে আসতেই একটু রোমাঞ্চিত হলাম। এর আগেই শুনেছিলাম যে আমার শৈশবের সাথী স্কুলের গণ্ডী পার না হওয়া "তরবরি" এখন বাংলার সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সমরেশ বসু নামে খ্যাত। দীর্ঘ ত্রিশ বছর পেরিয়ে গেছে। সংসার সংগ্রামে ছিটকে পড়েছি দুই বন্ধু। 'তরবরি' প্রায় বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে—ঠিক সেইসময় কালীদি (সমরেশের ভ্রাতৃবধূ) হঠাৎ একদিন আমাদের পার্কসার্কাসের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। সমরেশের বড়দা যাকে বিয়ে করেছিলেন সম্পর্কে তিনি আমাদের দিদি হতেন। বড়দা মন্মথ, মেজদা প্রমথ আর সমরেশ ছিলেন সুরথ। পৈত্রিক দেওয়া নাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 'তরবরি' যে কখন 'সমরেশ' নাম ধারণ করেছে সেটাও ছিল আমার কাছে অজ্ঞাত। প্রমথ ও সুরথর ডাক নাম ছিল বীরবল ও তরবল। সেই তরবল নামেরই অপভ্রংশ 'তরবরি' বলে ডাকতাম আমরা। কালীদিকে বীরবল ও তরবরির খবর জিজ্ঞাসা করতেই খুব অবাক হয়ে বললেন, "সাহিত্যিক সমরেশ বসুর নাম শোননি ? সেই তো তরবরি। আর বীরবল ডাক্তারী করছে সোদপুরে।"

খুবই অবাক হয়েছিলাম সেদিন। সাংবাদিকতার পেশা ছেড়ে নিরস সরকারী চাকুরীতে ঢোকার পর সাহিত্য জগতের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। সমরেশ বসুর (কালকূট) "অমৃতকুম্ভের সন্ধানে" বইখানি শুধু পড়েছিলাম। এই অনবদ্য বইয়ের লেখক আমাদের তরবরি হতেই পারে না। যাই হোক কালীদির সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে চুপ করে গিয়েছিলাম সেদিন। পরে অনেকের মুখেই শুনে শুনে অবিশ্বাস্য হ'লেও তরবরি-ই যে সাহিত্যিক সমরেশ বসু এই সত্যকে গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে মেনে নিতে হয়েছে। ছেলেবেলাকার তরবরির সঙ্গে অবাধ মেলামেশার উপর অভিভাবকের কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল। যে অকালপক্ক বালক

রক্ষণশীল অভিভাবকদের নিষেধাজ্ঞার বাঁধন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" পড়ার মতো দুঃসাহস দেখাত, যে সমরেশকে পেছনের সারির অপগণ্ড ছাত্র হিসাবে তখন অনেকেই একটু অন্য নজরে দেখত—সেই সমরেশ আমাদের 'তরবরি' যে বাংলা সাহিত্য জগতের একজন দিক্‌পাল হয়ে উঠবে এটা ছিল কল্পনারও অতীত। সমরেশের বন্ধু হিসাবে গর্বিত বোধ করে একদিন স্ত্রীকে বলেছিলাম, "জান, যে সমরেশের তুমি একজন একনিষ্ঠ ভক্ত সেই সাহিত্যিক সমরেশ বসু আমার বাল্যবন্ধু।"

স্ত্রী শুধু মাথা নেড়ে জানিয়েছিলেন, "তাই নাকি?"

ছোট্ট শহর দার্জিলিং। বিকেল হতেই আবালবৃদ্ধবনিতা ভিড় জমাত ম্যালে সান্ধ্যভ্রমণ উপভোগ করতে। অফিসের কাজের পর সেদিন আমি ম্যাল থেকে সান্ধ্যভ্রমণের শেষে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময় দেখি বিপরীত দিক থেকে দু'জন ভদ্রলোক ম্যালের দিকে যাচ্ছেন। পিছনে অগণিত ভক্তের দল। মিসেস্ দত্ত আমার দিকে এক টা বিদ্রূপ বাণ ছুঁড়ে দিলেন, "তুমি যে বলেছিলে সমরেশ বসু তোমার বন্ধু। তোমাকে পাশ কাটিয়ে উনি তো চলে যাচ্ছেন—কই, তোমাকে তো চিনলেন না।"

আত্মাভিমানে লাগল। বস্তুত এত বছর বাদে আমাদের পরস্পরকে চেনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কৈশোরের চাপল্য এখন প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্যে পর্যবেশিত। জনতার ভিড় ঠেলে সমরেশের সামনে সটান দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি তরবরি না? আমাকে চিন্‌তে পার?"

বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ-তাকিয়ে থেকে সমরেশ বলে উঠল, "হাঁ, আমি তরবরিই বটে। কিন্তু এই নামটা তো আমার বহুকাল হ'ল হারিয়ে গেছে। আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।" তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি নিশ্চয়ই চুনী। আমার এই হারিয়ে যাওয়া নামের সন্ধান আর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুনেছি যে তুমি সরকারি চাকুরী নিয়ে দার্জিলিঙে এসেছ। নতুবা তোমাকে চেনার কোন উপায়ই ছিল না।"

মিসেস দত্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমি বললাম, "তোমাকে খুঁজে পাওয়ার মূলে কিন্তু এই ভদ্রমহিলা, আমার স্ত্রী যিনি তোমার অগণিত ভক্ত পাঠক-পাঠিকাদের অন্যতম। বস্তুতঃ উনি তোমাকে দেখিয়ে না দিলে আমিও তোমাকে কিছুতেই চিনতে পারতাম না।"

তারপর অনেক পীড়াপীড়ি করলাম কোথায় উঠেছে জানবার জন্য। কিন্তু সমরেশ কিছুতেই আমাকে ওর ঠিকানা দিল না। মুচ্‌কি হেসে বলল, "তুই বরং তোর ঠিকানাটা দে। আমিই তোর সঙ্গে যোগাযোগ করব।"

মনটা দমে গেল। সমরেশ এত বড় সাহিত্যিক হয়ে তবে কি দাম্ভিকতার শিকার হয়েছে যে বাল্যবন্ধুকে তার ঠিকানা পর্যন্ত দিতে এত কুণ্ঠা। মিসেস্ দত্তর কাছে নিজেকে একটু ছোট মনে হল। যাই হোক এক টুকরো কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। মনে মনে ভাবলাম পুরোনো বন্ধুত্বটা নতুন করে না ঝালালেই হ'ত। ওর আর আমার পথ এক নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন।

হঠাৎ দেখা সমরেশকে ঘিরে অনেক স্মৃতি একে একে মনের কোণে উঁকি দিতে লাগ্‌ল। আমাদের ছোট্টগ্রাম চারিগাঁর কথা—যেটা সমরেশের ছিল মাতুলালয়। আর এই মাতুলালয়েই সমরেশ প্রায়শই আসত ছুটি কাটাতে—অনেকদিন ধরে থাকত। মনে পড়ে গেল সেই অতীতের কথা, দাদুর কাছে কতদিন কানমলা খেয়েছি সমরেশের সাথে বন্ধুত্বের খেসারত দিতে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল আমাদের ছোট্টগ্রামের ছোট্ট লাইব্রেরিটার কথা—সে লাইব্রেরিতে এমন গল্প বা উপন্যাসের বই ছিল না যেটা সমরেশের অপঠিত ছিল। সমরেশের জীবন কখনও সুরোধ বালকের মতো বাঁধাধরা গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইস্কুলের পাঠ্য পুস্তকের আকর্ষণ অপেক্ষা গল্প, উপন্যাসের জগতের আকর্ষণ ছিল ওর কাছে অনেক বেশি।

একটা ঘটনা কিছুতেই ভুলতে পারিনি। আমাদের গ্রামের লাইব্রেরি থেকে "পল্লীবাসী" নামে একটা হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। আমরা অনেকেই তাতে লিখতাম। সমরেশ পল্লীবাসীতে কোন লেখা দিয়েছে বলে মনে নেই। তবে ওর ভূমিকা ছিল সমালোচকের। কোন্ লেখা বিশেষত্বহীন, কোন্‌টা ধারকরা এইসব। অমূল্য ভৌমিক বলে এক ভদ্রলোক "পল্লীবাসী"র সেরা লেখক ছিলেন। আমরা তাকে অমূল্যদা বলে ডাকতাম আর খুব সমীহ করতাম। সমরেশ হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, অমূল্যদার "চায়ের পেয়ালা" নামক যে লেখাটা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে সেটা বহুদিন আগে একটি প্রথমশ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত একজন নামকরা লেখকের হুবহু নকল করা। তারপর অমূল্যদা চাকুরী নিয়ে সেই যে বাইরে গেলেন আর তাকে আমরা গ্রামে ফিরতে দেখিনি। শুনেছি অমূল্যদা ঢাকা শহরে পরলোকগমন করেছেন।

রাত্রিতে খাবার পর এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। কলিং বেলের আওয়াজে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শীতের জায়গায় সাধারণত এত সকালে কেউ ঘুম থেকে গাত্রোত্থান করে না। বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি তরবরি—সাহিত্যিক সমরেশ বসু। স্বভাবসুলভ মিষ্টি হাসি দিয়ে বলতে লাগল, "কি, ঘুম ভাঙালাম তো? বস্তুত এই কাকভোরে তোদের বিরক্ত করার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করব বল? মনটা খচ্ খচ্ কচ্ছিল। বার বার চাওয়া সত্বেও তোকে ঠিকানা দিতে পারিনি। কেন জানিস? এখানে আমি একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। ঐ ভিড়ের মধ্যে তোকে ঠিকানা দিলে আর উপায় থাকত না। দলে দলে লোক এসে ভিড় জমাত আর আমার লেখার বারোটা বাজাত। তুই আবার কি ভেবেছিস্ কে জানে।"

আমার বুক থেকে যেন একটা পাষাণ নেমে গেল। আমার বাল্যবন্ধু যশ ও সম্মানের শিখরে বসেও যে আমাকে আগের মতোই মনে রেখেছে এটা ভেবে গর্বে বুক ফুলে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে দুই বন্ধু মিলে শৈশব ও কৈশোরের ফেলে আসা পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাতে লাগলাম। অফিসের তাড়া ছিল। তদুপরি পরদিনই দশ দিনের ক্যাম্পে কালিম্পং যাওয়ার কথা। তাই একটু ব্যস্ত ছিলাম। সন্ধ্যায় আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমরেশ বিদায় নিল।

সন্ধ্যায় আবার এল সমরেশ, সঙ্গে বিকাশ বসু। পরিচয়ের পর জানলাম যে উনিও সাহিত্যিক—কোন একটা মাসিক পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। সমরেশ বলল, "সবে তোকে নতুন করে পেলাম। এর মধ্যেই আবার দশ দিন কালিম্পং কাটাবি। ফিরে এসে তো আর আমার সঙ্গে দেখাই হবে না।"

অদূরে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা কেয়া বসেছিল। সেই বছর বি. এ. পরিক্ষার্থিণী। আব্দারের সুরে অনুরোধ করল, "Uncle, তুমিও চল-না আমাদের সঙ্গে। খুব মজা হবে।" তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "বাপী তুমি একটা আলাদা বাড়ি ভাড়া কর—যাতে uncle-এর লেখার কোন অসুবিধা না হয়।" ছোট বোন মন্টিও যোগ দিল দিদির সঙ্গে।

ভাইঝি-দের আব্দার uncle ফেলতে পারল না। এক কথায় রাজী হয়ে গেল। তবে একটা শর্তে—ওর সঙ্গে বিকাশ বসুও যাবে। আর লেখার পরিবেশ নষ্ট না হয় এমন একটা আস্তানা তার চাই।

আমি বললাম, "এ তো খুবই আনন্দের কথা। তোর পছন্দমতো জায়গা করে দেব আর আমি অফিস করব Inspection Bunglow-তে।"

আমি, আমার স্ত্রী, দুই মেয়ে ও চাকরসহ কালিম্পং রওয়ানা হলাম। সঙ্গে চললেন সাহিত্যিকদ্বয় বিকাশ বসু ও সমরেশ বসু।

কালিম্পং-এ একসাথে অনেক স্ফূর্তি করেছি—অনেক জায়গা বেড়িয়েছি, তাস খেলেছি, সারারাত ধরে গল্প করেছি। একদিন ঠাট্টা করে সমরেশকে বললাম, "তরবরি, তোর নামে যে সব লেখা বেরুচ্ছে সেগুলো সত্যি তুই লিখিস না আর কেউ তোর নামে লিখে দেয়। ইস্কুলের এই সামান্য বিদ্যা নিয়ে এরকম লেখা কি করে সম্ভব?"

মিষ্টি হাসি হেসে সমরেশ বলেছিল, "তুই তো বঙ্গসাহিত্যের এম. এ.। আমার পড়া ধর-না মাস্টারমশাই হয়ে।"

ওর কাছেই শুনলাম যে, ওর প্রথম গল্প "আদাব" বেরিয়েছিল পরিচয় পত্রিকায়। এই গল্পটি পরে বহুভাষায় অনূদিত হয়। পরিচয়ে "আদাব" প্রকাশের পরে পরবর্তী লেখাটি ফিরে আসে সমরেশের কাছে। সম্পাদকের মতে "আদাব" গল্প পাঠকপাঠিকার কাছে সমরেশের যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এই লেখা প্রকাশিত হলে সেটা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা।

লেখার ফাঁকে ফাঁকে সমরেশকে দেখেছি আমার অফিসে উল্টোদিকের চেয়ারে বসে থাকতে। যখন আয়কর ধার্যের শুনানী চলছে তখন ওকে দেখেছি মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করতে। হয়তো সে এখান থেকেও সাহিত্যের উপকরণ খুঁজে বেড়িয়েছে।

আমাদের এই আকস্মিক মিলনের কাহিনী শারদীয় দেশ পত্রিকায় (১৩৮২) সমরেশ (কালকূট) "তুষার সিংহের পদতলে" লিপিবদ্ধ করে গেছে।

সাতদিন একসঙ্গে থাকার পর সমরেশ ও বিকাশবাবু বিদায় নিয়ে কোলকাতা চলে এল। কালক্রমে আমিও আবার বদলি হয়ে ফিরে এলাম কোলকাতায়। সমরেশ-পত্নী টুনি দেবী আমাদের নিমন্ত্রণ জানালেন। নিমন্ত্রণ খেতে খেতে পরিচয় হল টুনি দেবীর সঙ্গে। যে আন্তরিকতা সেদিন পেয়েছিলাম তা কোন-দিনই ভুলবার নয়। তারপরেও ওঁর স্ত্রী কয়েকবার আমার নতুন বাড়িতে এসেছেন।

আমার মায়ের সঙ্গে ছিল সমরেশের নিবিড় সম্পর্ক। সমরেশের নতুন বই পাঠকপাঠিকার হাতে পৌঁছুবার আগেই মায়ের পড়া হয়ে যেত। মায়ের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিল সমরেশ। আমার হাত চেপে ধরে বলেছিল, "আজ মনে হচ্ছে নতুন করে মাতৃহারা হলাম।"

শেষবারের মতো সমরেশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মিণ্টোপার্কে প্রাতঃভ্রমণ উপলক্ষে। লক্ষ করেছিলাম ওর স্বাস্থ্যের অবনতি।

সেদিনও স্বভাবসুলভ মিষ্টি হাসিতে ভরে উঠেছিল ওর মুখ। আমাকে বলেছিল, "শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছে। ঠিক হয়ে যাবে।"

ঠিক আর হল না। তার বিশদিনের মধ্যেই ওর মৃত্যু সংবাদ বজ্রাঘাতের মতো এল। শুধু এইটেই দুঃখ থেকে গেল যে, এত কাছে থেকেও শেষবারের মতো প্রিয় বন্ধুকে বিদায় জানাবার সুযোগ পেলাম না। কার্যব্যপদেশে ঠিক সেই সময়ই কোলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল।

BIVAV

Price : Rs. 8·00 | 40th Special Issue | Reg. No.
Vol. 11. No. 2 | Published in June 88 | R. N. No. 30017/76

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL No. ISSN 0970 – 1885

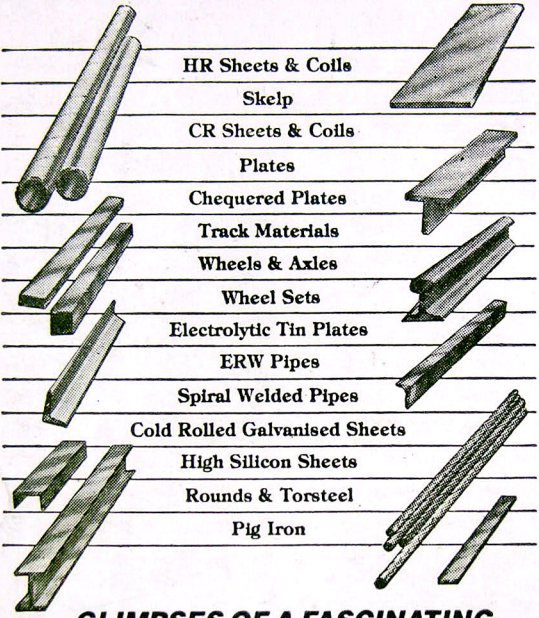

...GLIMPSES OF A FASCINATING PRODUCT PANORAMA

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
CENTRAL MARKETING ORGANISATION
10 Camac Street, Calcutta 700017

CONTAD/SAIL/81-88